KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : 28 চৌরিঙ্গী রোড, কলকাতা-২৬
Collection : KLMLGK	Publisher : অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
Title : সমকালীন (SAMAKALIN)	Size : 7"x9.5" 17.78x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৮/- ৮/- ৮/-	Year of Publication : অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯ ফাল্গুন, ১৩৫৯ আষাঢ়, ১৩৫৯
	Condition : Brittle / Good
Editor : অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

সম্পাদক। আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

অষ্টম বর্ষ ॥ ফাল্গুন ১৩৬৭

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

মিলিত প্রচেষ্টা

ভারতের
জনসাধারণের জন্য
দুর্গাপুরে একটি
স্বয়ং-সম্পূর্ণ
ইস্পাত কারখানা
নির্মাণের উদ্দেশ্যে
অভিজ্ঞ ব্রিটিশ
যন্ত্রবিদ্, ব্রিটিশ
যন্ত্রপাতি ও ব্রিটিশ
শিল্পের সঙ্গে
ভারতীয় শ্রম
ও নৈপুণ্য
মিলিত হয়েছে।

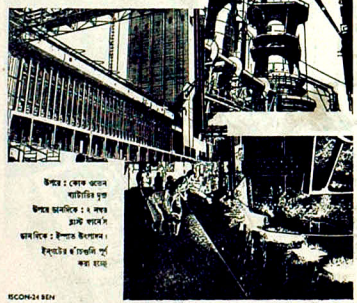

উপরে : কোক ওভেন ব্যাটারির দৃশ্য
উপরে অবদিকে : ৪ নম্বর ব্লাস্ট ফার্নেস
ডানদিকে : ইস্পাত উৎপাদন। ইন্‌গটের ক্রাশিং পূর্ণ করা হচ্ছে

ইস্কন

ইণ্ডিয়ান স্টীলওয়ার্কস্ কন্‌স্ট্রাক্‌শন্ কোং লিঃ

ডেভি এণ্ড ইউনাইটেড এঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড
হেন হাইটন্‌স্ অ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ মাইকন-কার্সন লিঃ দি প্রসেসবাব
লিম প্রসেস এঞ্জিনীয়ারিং কর্পোরেশন লিঃ দি লিঙ্কেন্‌ট্রন
কোম্পানি লিঃ ব্রিটিশ ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল কোম্পানি লিঃ দি ইংলিশ ইলেকট্রিক
কোম্পানি লিঃ দি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি লিমিটেড
মেট্রোপলিটান-ভাইকার্স ইলেকট্রিক্যাল এক্সপোর্ট কোম্পানি লিঃ
ভার ইরিগেশন এ্যাণ্ড অ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ ব্রিটিশ্যাম্প ট্রিজ
অ্যাণ্ড এঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানি লিঃ ওয়ার্থ্যাম লঃ (ট্রেন অ্যাণ্ড
এঞ্জিনীয়ারিং) লিঃ জেনারেল পার্কিং অ্যাণ্ড লুব্‌ লিঃ
ইন্ডিয়া ফেল্ট্‌ ক্লথ (মিলস) এডিসন মোহাম লিঃ এবং
সিমেন্স ব্রেদার্স ফেল্ট ওয়ার্কস্ লিঃ

এই ব্রিটিশ কোম্পানিগুলি ভারতের সেবায় রত

ISCON-24 BEN

অষ্টম বর্ষ। একাদশ সংখ্যা সমকালীন ফাল্গুন তেরশ' সাতষট্টি

॥ সূচীপত্র ॥

পূর্বরঙ্গকর্মের শেষ-প্রয়োগ ॥ অমিয়নাথ সান্যাল ৬৪৯

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রগতিধারা ॥ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ৬৬০

রবীন্দ্র-রচনা সূচী ॥ পুলিনবিহারী সেন। পার্থ বসু ৬৬৭

জাল প্রতাপচাঁদের মামলায় দ্বারকানাথ ॥ অমৃতময় মুখোপাধ্যায় ৬৭২

ভারতের বহির্বাণিজ্য ॥ প্রফুল্লকুমার সরকার ৬৮৪

নবনাট্য আন্দোলন ॥ মলয়শংকর দাশগুপ্ত ৬৮৯

সমালোচনা ॥ আরবী, রাম ভট্টাচার্য ৬৮৯

॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

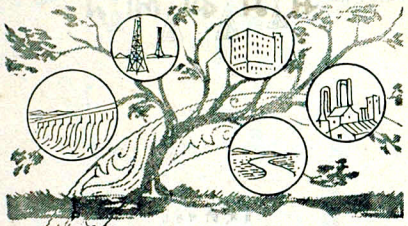

আপনার **স্বল্প সঞ্চয়**

কি হয়ে ওঠে দেখুন!

একদিকে যেমন আপনার সঞ্চিত অর্থ উচ্চহারের সুদে সম্পূর্ণ নিরাপত্তায় দিনে দিনে বেড়ে উঠতে থাকে অন্যদিকে সরকার সেই অর্থ দিয়ে কৃষির উন্নতি, আরও ফ্যাক্টরী, ভালো ভালো রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র, বিদ্যালয়, হাসপাতাল ইত্যাদি করিয়ে দেশবাসীর কর্মসংস্থান ও অন্যান্য সুখসুবিধার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন।

স্থানীয় পোষ্ট অফিসে অন্যান্য বিবরণের জন্য অনুসন্ধান করুন।

বেশী মুনাফা

স্বল্প সঞ্চয় পক্ষতে আরও বেশী সঞ্চয় করুন

১লা মার্চ হইতে ১৫ই মার্চ পর্যন্ত

DIP/Assam/N5

অষ্টম বর্ষ। একাদশ সংখ্যা

সমকালীন

ফাল্গুন তেরশ' সাতষট্টি

পূর্বরঙ্গ কর্মের শেষ প্রয়োগ

অমিয়নাথ সান্যাল

পূর্বরঙ্গ অনুষ্ঠানের প্রয়োগ সম্বন্ধে সাধারণ বিধি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। সম্প্রতি সাধারণ বিধির অবিরোধে বিশেষ বিধিও উপদেশ করার প্রয়োজন ঘটেছিল।

বিশেষ বিধির প্রয়োজন

পূর্বরঙ্গ কর্ম বারান্তর সাধ্য। বারম্বার সাধনের প্রয়োজনীয়তা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু, বিশেষ এক শ্রেণীর, অথবা দুই শ্রেণীর নাট্য পরিকল্পনা পক্ষে, পূর্বরঙ্গ বারান্তর সাধ্য, অধিকন্তু প্রকারান্তর বিশেষেও সাধ্য। এই কারণেই 'শেষ-প্রয়োগ' প্রসঙ্গে বিশেষ বিধি উপদিষ্ট হয়েছে। ব্যাপারটি সংক্ষেপে আলোচ্য।

প্রেক্ষকসাধারণের প্রতীতির মধ্যে কাম্য প্রভাব সৃষ্টি করাই নাট্যের উদ্দেশ্য*। উদ্দেশ্যের সিদ্ধিকেই সংক্ষেপে 'সিদ্ধি' বলা হয়েছে (২৭ অঃ)। পরিকল্পনার স্বার্থ ও সুবিধার প্রতি দৃষ্টি করে তিন প্রকার সিদ্ধি উদ্দিষ্ট ও বর্ণিত হয়েছে। যথা, দৈবিকী, দিব্যমানুষী, ও মানুষী সিদ্ধিত্রয়। যে নাট্য পরিকল্পনার মধ্যে পুরাণাদি কথিত ঈশ্বরগণের, অথবা দিব্যাগণের, অথবা দেব-দেবতাগণের (ইন্দ্রাদি) অথবা সংসিদ্ধ পুরুষগণের (উদ্দর্গ, ত্রিলোকবিহারী সিদ্ধ পুরুষ ১৩অঃ ২৪ শ্লোক) কোনও ব্যক্তি নায়ক-নায়িকা রূপে অভিব্যক্ত হন, সে রকম পরিকল্পনায় দৈবিকী সিদ্ধি (২৭ অঃ ১৬-১৭ শ্লোক) বা দিব্য প্রভাবই লক্ষণীয় ও কাম্য। যে রকম পরিকল্পনার কেন্দ্রস্থলে নায়ক ও উপনায়ক রূপে একজন ঈশ্বরাদিতুল্য ব্যক্তি এবং অন্যজন প্রখ্যাতনামা মানুষ আবির্ভূত হন, তার পক্ষে দিব্য মানুষী সিদ্ধি বা প্রভাবই লক্ষণীয় ও কাম্য। **প্রকারান্তরে বলা যায়, অলৌকিক ও অদ্ভুতের সমন্ধ পরিকল্পনা ব্যতীত দৈবিকী প্রভাব-সিদ্ধি অসম্ভব। এবং লৌকিক অলৌকিক মিশ্রিত ও সমন্ধ পরিকল্পনা ব্যতীত দিব্য-মানুষী প্রভাব-সিদ্ধি আশা করা যায় না।**

তৃতীয়ত, যে নাট্য পরিকল্পনার মধ্যে উত্তম মনুষ্য বিশেষই নায়ক, এবং ঈশ্বরাদি অলৌকিকবর্গের অবতারণা নেই, সে রকম লৌকিক অথচ সমন্ধ পরিকল্পনা পক্ষে উত্তমা মানুষী সিদ্ধি আশা করা যায়।

২০ অধ্যায়ে বর্ণিত দশরূপ কাব্যবন্ধের সংশ্লিষ্ট উপদেশাবলী অনুশীলন করলে বুঝা

যায় নাটক, প্রকরণবিশেষ, সমবকার, ইহামৃগ ও ডিম নামে পাঁচটি কাব্যবন্ধ-রূপে নাট্যে প্রতিফলিত হলে দৈবিকী সিদ্ধি ও দিব্যমানুষী সিদ্ধি প্রেক্ষক-সাধারণকে প্রভাবিত করে। এ সকলের মধ্যে উৎকর্ষ রূপে যদি কোনও ঈশ্বর বা দিব্য পুরুষ (প্রাচীন মতে) নায়ক বা নায়িকা হন এবং কৈলাস বা স্বর্গাদি অলৌকিক অধিষ্ঠান কর্ম-ক্ষেত্র রূপে অভিব্যক্ত হয়, তাহলে সেই কাব্যবন্ধাশ্রিত নাট্য অবশ্যই উৎকৃষ্ট রূপ দৈবিকী সিদ্ধিপ্রভাবের আশা দান করে। এতদ্‌ব্যতীত অপর পাঁচটি কাব্যবন্ধ এবং নাটিকা নামে কাব্যবন্ধ নাট্যে প্রতিফলিত হলে—মানুষী প্রভাব-সিদ্ধিকে প্রত্যাশিত করে।

অনুরূপ ভাবে, পূর্বরঙ্গ অনুষ্ঠানেরও প্রকারভেদ সংক্ষিপ্ত ও বিশেষ বিধির আকারে উপদিষ্ট হয়েছে। যথা, সর্ববিধ মানুষী সিদ্ধির লক্ষিত নাট্য পরিকল্পনার পক্ষে **'শুদ্ধ'** নামে পূর্বরঙ্গ প্রস্তুতি। **'শুদ্ধ' অর্থাৎ অবিমিশ্র, কেবল-মানুষী সিদ্ধির পর্যায় সূচক;** "শুদ্ধ" অর্থে পবিত্র নয়। পুনশ্চ 'চিত্র' ও **"মিশ্র"** নামে পূর্বরঙ্গ প্রস্তুতি। এ দুটি যথাক্রমে দৈবিকী ও দিব্য-মানুষী প্রভাব-সিদ্ধির অনুগত প্রস্তুতি। বলাই বাহুল্য, পূর্বরঙ্গের সাধারণ বিধি 'শুদ্ধ' 'চিত্র' ও "মিশ্র" পরিকল্পনার পক্ষে মেরুদণ্ড স্বরূপ ন্যূনতম অপরিহার্য পর্যায়।

বারান্তর সাধ্য অথচ সাধারণ-পূর্বরঙ্গ প্রস্তুতি পক্ষে প্রথম বারে আঙ্গিক-বাচিক অভিনয় ইত্যাদি করণীয়। দ্বিতীয় বারে আঙ্গিক-বাচিক ও আহার্য অভিনয়ের প্রয়োগ পরীক্ষা ইত্যাদি করণীয়। তৃতীয় বারে আঙ্গিক-বাচিক আহার্য-সাত্ত্বিক অভিনয়, তথা গীত-বাদ্য-নৃত্তাদির প্রয়োগ পরীক্ষা ইত্যাদি করণীয়। প্রতিবারেই পুষ্পদলবিকাশ ন্যায়ে নান্দী ত্রিগত ইত্যাদি প্রযোজ্য। ইতি 'শুদ্ধ' বা সাধারণ বিধি।

অতঃপর, এই তৃতীয়বারে আরভ্য পর্যায় ও বিধির অবসরে 'চিত্র' নামে বিশেষ পর্যায় ও বিধির অবতারণা।

'চিত্র' পূর্বরঙ্গ

নাট্যশাস্ত্রীয় পরিভাষার মধ্যে এই 'চিত্র' শব্দের মূলে একটি ঐতিহ্য-আখ্যায়িকা আছে। প্রাসঙ্গিক কাহিনী (৪ অধ্যায়) যথা—ব্রহ্মা ও ভরতাদি ব্যক্তিরা মহাদেবের সম্মুখে "ত্রিপুরদাহ" নামে ডিম-সংজ্ঞক কাব্যরূপকে নাট্যে রূপায়িত করেছিলেন (৪ অঃ ৫-১০ শ্লোক)। তার মধ্যে মহাদেব ও ভূতগণের ভূমিকাভিনয় ছিল। কিন্তু—তাণ্ডব-বিধির অনুযায়ী নৃত্ত ছিল না। কারণ, তখন পর্যন্ত ব্রহ্মা ও ভরত তাণ্ডব-নৃত্ত বৃদ্ধি জানতেন না। যাই হক, ব্যাপারটি একটু কাঁচা ছিল। মহাদেব আশুতোষ। তিনি ব্রহ্মাকে বললেন "হে মহামতে! আপনার সৃষ্ট এই নাট্য যশস্য, শুভার্থ, পুণ্য ও বৃদ্ধিবর্ধন হক! কিন্তু! আমিও প্রতি সন্ধ্যাকালে এই ঘটনার স্মরণার্থে নৃত্য করি। আপনি নানাকরণসংযুক্ত ও অঙ্গহারবিভূষিত এই নৃত্তকে পূর্বরঙ্গ বিধিগত ভাবে প্রয়োগ করুন।" অর্থাৎ—ব্রহ্ম-ভরতাদি কর্তৃক প্রয়োগে দোষ ঘটেছিল। নায়ক হলেন শিব; বীর-বীভৎস-

* এর মধ্যে রাজনীতি বা ধর্মনীতি বা অর্থনীতি বা কামনীতি কিম্বা মোক্ষনীতির প্রচার বলতে কিছু নেই। অর্থাৎ এ সমস্ত উদ্দেশ্য নাট্যপরিকল্পনার মধ্যে স্থান পায় নি। কোনও দর্শক ব্যক্তিগত মনোভাব বা প্রবণতার কারণে যে উদ্দেশ্য আবিষ্কার করেন, তাকে নাট্যের উদ্দেশ্য মনে করা হয়নি। যথা উত্তম ফল সেবনের উদ্দেশ্যে কাঁঠাল গাছ তৈরী করার পর দেখা গেল গাছটি কাঁঠাল কাঠের উত্তম তক্তা তৈরী করার যোগ্য ভাবে গড়ে উঠেছে। অতঃপর, আশু প্রয়োজনে গাছটি কেটে তক্তা প্রস্তুত করে বিক্রয় করে অন্য এক বা বহু রকমের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হতে পারে। কিন্তু—এরকম উদ্দেশ্য ছিল না। এবং এরকমের বহু উদ্দেশ্যকে উক্ত উত্তম ফলদাতা কাঠালগাছের লাগানার উদ্দেশ্য বলা যেতে পারে না।

রৌদ্র হল পরিকল্পনা। তার মধ্যে সাধারণ মনুষ্যোচিত নৃত্তের স্থান নেই। শিবের এই ছিল ইঙ্গিত। স্পষ্টতঃ বললেন যে পূর্বরঙ্গ কর্মটি চেলে সাজুন, করণ-অঙ্গহারযুক্ত নৃত্ত যোজনা করুন।

বর্ধমানকযোগেন গীতেষ্বাসাদিতেষু চ।
মহাগীতেষু চৈবার্থান্ সম্য গেবাভিনেষ্যসি।।

অর্থাৎ "আর দেখুন, সেই পূর্বরঙ্গের মধ্যে আসাদিত (আসারিত) গীত সকলের এবং মহাগীত সকলের (শিবস্তুতিবাচক গীত সকলের) অবসরে বর্ধমানযোগসহকৃত সকল পুনর্রূপে অভিনয় করুন"। এ স্থলে "অর্থান্" অর্থ শৃঙ্গারাদি মূলরসচতুষ্টয় (অঃ ৩৮ শ্লোকের পর গদ্যাংশ) এক মাত্র শিব-নায়কত্বেই এ প্রকার সর্বরস-প্রয়োগ সম্ভব। পুনশ্চ, মহাদেব বললেন—

যচ্চায়ং পূর্বরঙ্গস্তু তুয়া শুদ্ধঃ প্রযোজিতঃ।
এভির্বিমিশ্রিতশ্চায়ং **চিত্রো** নাম ভবিষ্যতি॥

অর্থাৎ—আপনি এই যে শুদ্ধ পূর্বরঙ্গ প্রয়োগ করলেন, এই শুদ্ধ পূর্বরঙ্গ উক্ত বর্ধমানকযোগাদি দ্বারা বিশেষ রূপে মিশ্রিত হয়ে "চিত্র" ইতি নামে খ্যাত হবে।

অতএব "চিত্র পূর্বরঙ্গ" শব্দের ঐতিহ্য পক্ষে শ্রুতির মূল হ'ল মহাদেবের একটি বাক্য। প্রসঙ্গত এই আখ্যানের মধ্যে দুটি রহস্য আছে। প্রথম, ব্রহ্মা ও ভরত ত্রিপুরদাহকে পূর্ণাঙ্গনাট্য মনে করেই মহাদেবের সম্মুখে প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু—মহাদেব দেখলেন এটি পূর্ণাঙ্গনাট্য নয়! কারণ, চারী-মহাচারী ও বর্ধমানক নৃত্তযোগ ঐ নাট্যে ছিল না। মহাদেব এই প্রয়োগকে পূর্বরঙ্গ রূপে গ্রাহ্য করে, এর অভাব-দোষটি দেখিয়ে দিলেন। দ্বিতীয়—'অর্থান্' শব্দে বহু রস সূচিত করে। 'অর্থ অর্থে 'প্রাপ্তি'; যে কার্য করে যে উত্তমা প্রাপ্তি ঘটে সেই কার্যের পক্ষে সেই প্রাপ্তি=অর্থ। 'অর্থান্' শব্দের বহুবচন দ্বারা কমপক্ষে তিনটি রস অবশ্যই সূচিত করে। সতর্ক প্রশ্ন হয়, অষ্টরসের তিনটি রস, অথবা রসচতুষ্টয়ের তিনটি রস? উত্তরে বলা যায়, মূল রস যখন চারটি, তখন রসচতুষ্টয়ের মধ্যে তিনটি রসই এ স্থলে সূচিত প্রশ্ন হয়, কোন্ তিনটি? এর উত্তরে বলা যায়, অবশ্যই, শৃঙ্গার ও বীর এই দুটিকে নিয়ে, অন্য রৌদ্র ও বীভৎসের যে কোনও একটি ইতি তিনটি।

কি হেতু? হেতু এই যে, **"চিত্র" অর্থই অদ্‌ভুত, আশ্চর্য, অনন্য সাধারণ। এ ক্ষেত্রে, রৌদ্র** ও বীভৎসের যোগ সাধারণ; বীর ও রৌদ্রের যোগও এমন কিছু আশ্চর্য নয়; বীর ও বীভৎস যোগও লৌকিক অভিজ্ঞতার পক্ষে চিত্র নয়। কিন্তু, শৃঙ্গার, বীর* এবং তৎসহ রৌদ্র অথবা বীভৎস অসাধারণ। এবং, শৃঙ্গার, বীর, রৌদ্র ও বীভৎস এক মাত্র নায়কের পক্ষে অনন্যসাধারণ ও অদ্‌ভুত মিশ্রণ সন্দেহ নেই। 'অর্থান্' দ্বারা চারটি রসের যোগ বাধিত হয় না।

মহাদেবের সমালোচনা ও উপদেশের তাৎপর্য এই যে—যে নাট্যে মহাদেব নায়ক, সেই নাট্যে মহাদেব লীলার বিচিত্র অভিব্যক্তি হওয়াই উচিৎ; এবং, সেই নাট্যের পূর্বরঙ্গ-প্রস্তুতির নাম হবে "চিত্র"। বিচিত্র অভিব্যক্তির উপায় হল চারী-মহাচারী সমেত তাণ্ডবনৃত্ত, তৎসহ বর্ধমানকযোগ এবং ন্যূনা পক্ষে শৃঙ্গার বীর ও অন্য একটির মিশ্রণ।

এবং, যে নাট্যে মহেশ্বর নায়ক না হ'লেও উপনায়ক রূপে আবির্ভূত, (কিরাতার্জুনীয়ম্

অমরকোষে 'অদ্‌ভুত' রসের প্রতিশব্দ রূপে 'চিত্রম্' পঠিত। "অদ্‌ভুত" অবশ্যই অদ্‌ভুত। কিন্তু, এর চেয়েও অদ্‌ভুত বা 'চিত্রম' হল শৃঙ্গার ও বীরের সঙ্গে রৌদ্র ও বীভৎস রসে মিশ্রণ। মাত্র "অদ্‌ভুত" দিয়ে অর্থসকলের প্রাপ্তি ঘটে না।

কাব্যের ইতিবৃত্ত) সে রকম মহেশ্বর-লীলা সংস্পর্শের কারণে, সেই মাহেশ্বরী লীলা মাত্র দুটি রস দ্বারা অভিষিক্ত হ'ক, এবং মাত্র চারী-মহাচারীই থাকবে, বর্ধমানক যোগ থাকবে না। মনুষ্য নায়কত্বের কারণে এ রকম নাট্যের পূর্বরঙ্গ প্রস্তুতিকে "মিশ্র" পূর্বরঙ্গ বলা উচিত।

৫ অধ্যায়ে ১৪১ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে 'শুদ্ধ' পূর্বরঙ্গের যাবতীয় উপদিষ্ট হয়েছে। এর পরে, ১৪২ শ্লোক থেকে ১৪৯ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে 'মিশ্র' ও 'চিত্র' পূর্বরঙ্গের সাধারণ-বিধি ও প্রমাণ-বস্তু সকল (স্ট্যান্‌ডারডাইজ্‌ড্‌ থিংস অ্যান্ড মেজারস) বর্ণিত হয়েছে ("এতৎপ্রমাণং নির্দিষ্টমুভয়োঃ পূর্বরঙ্গোঃ")।

অতঃপর, ১৫০ ও ১৫১ শ্লোকে বলা হয়েছে যে উক্ত "মিশ্র-চিত্র" বিধির মধ্যে "আকাশমার্গ সংশ্লিষ্ট পরিবর্ত ও দিগ্‌বন্দনা" প্রয়োগ পক্ষে ঐ দুই শ্লোক দ্বারা নির্দেশিত প্রমাণই গ্রাহ্য। কি হেতু? এই হেতু যে নাট্যের মধ্যে যদি স্বর্গাদি অলৌকিক আশ্রয় ঘটিত ব্যাপার প্রধান হয় তা হলে, সেই নাট্যে "আকাশ-চারী" প্রয়োগ (১১ তঃ ১০ শ্লোক থেকে ১৩ শ্লোক, ২৯ শ্লোক থেকে ৪৩ শ্লোক পর্যন্ত) অবশ্য রূপায়িতব্য। সুতরাং, সেই নাট্যের পূর্বরঙ্গে চারী-মহাচারী প্রয়োগের অবসরে এই আকাশচারী ও প্রযোজ্য এবং পরীক্ষনীয়। এতৎ সমস্তই আচার্যবুদ্ধির অর্থাৎ নির্দেশের অনুযায়ী কর্তব্য এ কথাও বিশেষ ভাবে এ স্থলে বলা হয়েছে। সমগ্র পূর্বরঙ্গের মধ্যে অকস্মাৎ এ রকম কথা বলার হেতু কি? হেতু এই যে সাধারণ নাট্যে আকাশচারী ও তদবস্থায় দিগ্‌বন্দনা প্রয়োজনীয় নয়; অসাধারণ ও অলৌকিক সংঘটনা যুক্ত নাট্যে আকাশচারী প্রভৃতি প্রয়োজনীয়। মিশ্র-চিত্র পূর্বরঙ্গে আকাশচারী প্রভৃতির প্রয়োগ করতে হলে নাট্যসংস্থদীয় কর্তৃপক্ষেরও বুদ্ধি প্রয়োজন হয়, কারণ যে অভিনেতা আকাশচারী প্রয়োগ করবেন তাঁকে রঙ্গমণ্ডপের উপরে শূন্যমার্গে ঐ ব্যাপারটি করে দেখাতে হবে। সুতরাং, এ স্থলে পূর্বরঙ্গ প্রস্তুতির মধ্যেই যান্ত্রিক কৌশল* ও অনুষ্ঠেয় হয়ে পড়ে। এই অনুষ্ঠানের যথাযোগ্য সাধ্যতার দায়িত্ব আচার্যের উপরই ন্যস্ত, কারণ, নাট্যসংশ্লিষ্ট অবান্তর কর্ম তথা শিল্পচাতুর্যপ্রয়োগের ব্যাপারে আচার্যই তত্ত্ব-ব্যবহারের নির্দেশকর্তা। এই হেতুতেই এই প্রসঙ্গ সমাপ্তি স্থলে বলা হয়েছে

আচার্যবুদ্ধ্যা কর্তব্য স্রগ্রতালপ্রমাণতঃ।
তস্মান্ ন লক্ষণং প্রোক্তং পুনরুক্তং ভবেদ্ যতঃ ॥ ১৫১ ॥ ৫ অঃ।

অর্থাৎ—আচার্যবুদ্ধি অনুসারে এ সকল আকাশচারী প্রভৃতি ব্যাপারে অধিকতর দীর্ঘ-প্রমাণ তাল প্রয়োগ না করে ত্রস্তপ্রমাণ (সমপরিমান আবৃত্তি ত্রয় বা তিন ফেরতা প্রমাণ) অবলম্বন করা উচিত। কারণ যান্ত্রিক অনুষ্ঠানে তিন্ ফেরতা ব্যাপার সুচারু রূপে সাধিত হয়েছে দেখলে অনুমান হবে যে পরিণাম নাট্যের কালে চতুরস্র-তাল প্রমাণ প্রয়োগ পক্ষে বিঘ্ন হবে না। ত্রস্র প্রমাণ পূর্বে শুদ্ধ সাধারণ পূর্বরঙ্গ ব্যাপারে বলাই হয়েছে; সুতরাং ভরত মুনি এ স্থলে পুনরুক্তি করলেন না।

প্রসঙ্গত, নাট্যশাস্ত্রের তালাধ্যায় কঠিনতম জটাজুট দ্বারা নিবদ্ধ। এ স্থলে জটা ছাড়ান যাবে না।

"আধুনিক থিয়েটার বা সিনেমা প্রস্তুতির অঙ্গে এরকম ব্যাপার সম্ভব হচ্ছে অতএব, প্রাচীনকালে এরকম ব্যাপার সম্ভব ছিল না" ইত্যাদি অদ্ভুত যুক্তি হাস্যকর। প্রাচীনকালের বুদ্ধি, প্রয়োজন ও কর্মকুশলতা ছিল কি না, এবং কোন বিষয়ে ও কি পরিমাণে সেই বুদ্ধি অধ্যবসায়িত হত, এরূপ প্রশ্নের মীমাংসা করতে হলে প্রাচীন গ্রন্থ অনুশীলনীয় আধুনিক সম্ভব-অসম্ভবতার দোহাই দিয়ে আরাম-কেদারা দার্শনিক বা গবেষক হলে চলবে না।

চিত্র পূর্বরঙ্গ বিধি

অবিমিশ্র 'চিত্র' পূর্বরঙ্গ অনুষ্ঠানের মূলগত সাধারই বিধি ও প্রমাণ-প্রয়োগ সকল চৌ-সং ১৪২ শ্লোক থেকে ১৫১ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে উপদিষ্ট হয়েছে।

বিশেষ বিধি চৌ-সং ১৫২ থেকে ১৭১ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে (কা-সং ১৫৩ শ্লোক থেকে ১৭৫ শ্লোক) উপদিষ্ট হয়েছে। উভয় সংস্করণের পাঠে ইতর-বিশেষ আছে, এবং অশুদ্ধ পাঠ ও আছে। শ্লোকসংখ্যার বিপর্যয় ত' সামান্য কথা! যাই হ'ক, উভয় সংস্করণের বিপর্যস্ত পাঠ এবং সন্দিগ্ধ পাঠ থেকে বিশোধিত সার ও প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধার করা যায়।

বৃত্তে হ্যুত্থাপনে বিপ্রঃ কৃতে চ পরিবর্তনে।
চতুষ্প্রকারদত্তাভিঃ সুমনোভিরলংকৃতে ॥
উদাত্ত গানৈ গন্ধর্বৈঃ পরিগীতৈঃ প্রমাণতঃ ॥
দেবদুন্দুভয়শ্চৈব নিনদেযু র্ভৃশং ততঃ ॥

এতৎ সমস্ত একটি শ্লোক রূপে গণ্য।

অন্বয় ব্যাখ্যা। হে বিপ্রাঃ! চতুষ্প্রকারদত্তাভিঃ (বাগঙ্গাদিচতুষ্প্রকারঃ অভিনয়ঃ পূর্বরঙ্গপরীক্ষার্থং ইতি তদভিনয়চতুষ্টয়ং যাভিং ভূমিকাপাত্রীভিঃ দত্তং পূর্বপূর্বস্মি এব কর্মস্মি অর্পিতং তাভিরেব পাত্রীভিঃ ইতি)অপি সুমনোভিঃ (একগ্রেমনোভিঃ পাত্রৈশ্চ) উত্থাপনে (উত্থাপনকর্মনি) বৃত্তে (আরব্ধে) চ পরিবর্তনে কৃতে (পরিবর্তকর্মনি চ কৃতে) অপি অলংকৃতে (সম্যগ্ অভিব্যাঞ্জিতে অলংকারলক্ষণমঃ "যদা সর্বে সমুদিতা একীভূতা ভবন্তি হি। অলংকার স তু তথা মন্তব্যে নাট্য যোক্তৃভিঃ ॥" সপ্তবিংশোঽধ্যায়ে দৃষ্ট্যব্যং) ইতি তাদৃশলক্ষণেন পরিবর্তকর্মণি অলংকৃতে সতি ততঃ গন্ধর্বৈঃ (গান্ধর্বপ্রযোক্তৃভিঃ এব পাত্রৈঃ) প্রামাণত (শাস্ত্রপ্রমাণানুসারেণ নতু লোকপ্রমাণানুসারেণ ইতি) উদাত্তগানৈঃ (তল্লক্ষণলক্ষিতৈরেব গানৈঃ) পরিগীতৈঃ চ সহ (পরিগীতৈঃ ত্রিসামাদি-সমগীতং তৈরব চ সহ) দেবদুন্দুভয়ঃঃ ভৃশং নিনদেয়ুঃঃ (দেবসভা যোগ্যাঃ গম্ভীরনাদাঃ বৃহদাকারা-বনদ্ধ বাদনীয়বিশেষঃ ভৃশং প্রবাদয়েয়ুঃঃ) চিত্রকর্মারম্ভ সূচনার্থং ইত্যবগন্তব্যম্।

বঙ্গানুবাদ। হে বিপ্রগণ! রস-বৃত্তি-অভিনয়ের চতুষ্প্রকারে কর্মে পরীক্ষোত্তীর্ণা পাত্রী সকল এবং একাগ্রমনাপাত্র সকল উত্থাপন ও পরিবর্ত কর্ম সাধিত করলে, তথা অলংকৃত হয়েছে ইতি নিশ্চিত হলে, অনুক্রমতঃ গান্ধর্বপ্রয়োগী পাত্রগণ দ্বারা শাস্ত্র প্রমাণানুসারতঃ উদাত্ত গান ও পরিগীতের সহযোগ সাধনীয়; এতদবসরে, দেবদুন্দুভি সকল ও চতুর্দিক থেকে বাদনীয়।

তাৎপর্য। নাটক কিম্বা উৎকৃষ্ট প্রকরণের আশ্রিত কোনও মহতী নাট্য পরিকল্পনার প্রস্তুতিই এই উপদেশের লক্ষ্য। সর্বরূপে উদিত সমস্ত কর্ম (২৭ অঃ ৯০, ১০০, ও ১০১ শ্লোকে লক্ষিত সুবাদ্যতা, সুগানত্ব, সুপাঠ্যত্ব, সুবিভূষণতা, সুমাল্যবরতা অর্থাৎ প্রয়োগ সমৃদ্ধি ও অলংকার) অলংকার রূপে সিদ্ধ হয়েছে। অতঃপর ভাবী নাট্যে যাঁরা বিশিষ্ট প্রকার গীতাদি পরিবেশিত করবেন, তাঁদের মধ্যে **গন্ধর্বভূমিকাধারী** পাত্রবর্গ সম্প্রতি উদাত্ত গান করবেন এবং পরিগীত প্রয়োগ করবেন। এতদবসরে পরিকল্পিত দেবসভার বিকল্পন অনুযায়ী বৃহৎ দুন্দুভি সকল বাদনীয়। কি হেতু এই দুন্দুভি সমারোহ? এটা কি দর্শকভুলান জাঁক-জমক? আদৌ সেরকম অভিপ্রায় নয়। যে নাট্য গৃহে এই চিত্রাখ্য পূর্বরঙ্গ অনুষ্ঠিত হবে, এবং পরে নাটক প্রকরণাশ্রিত উত্তমোত্তম নাট্যও প্রয়োজিত হবে, সেই বিকৃষ্ট নাট্যগৃহের সমগ্রত আয়তন=৬৪×৩২ ×১৬ হাত। এবং রঙ্গপীঠের আয়তন=২৪×৮ হাত। এর উর্ধ্বদেশ উন্মুক্ত। রঙ্গপীঠৌন্ধে কোন্ কোন্ স্থানে এবং ন্যূনাধিক কত সংখ্যক বৃহদ্ দুন্দুভির বাদন উৎকৃষ্ট ভাবে শ্রব্য হবে, তার

নির্ণয় নিঃসন্দেহ পরীক্ষা-সাপেক্ষ। **এই হল মুখ্য অভিপ্রায়।*** গৌণ অভিপ্রায় পরে আলোচিত হবে।

আপাততঃ এই শ্লোকে চিত্রকর্মের বিশেষ বিধি বলা হ'ল। কারণ এর বৈশিষ্ট্য আছে। চিত্রকর্মকে প্রস্তুত করার নিমিত্ত এর পূর্বে অন্তত চারবার পূর্বরঙ্গ প্রযুক্ত হয়েছে; বুঝতে হবে। এবং বুঝতে হবে যে চতুর্থবারের প্রয়োগ; **সংক্ষেপে শেষপ্রয়োগ** ("ততঃ শেষপ্রয়োগস্ত ন রাগজনকো ভবেদ্"১৬২ শ্লোক ৫ অঃ)। বৈশিষ্ট্য এই যে উত্থাপন-পরিবর্ত কর্ম প্রয়োগের সঙ্গে বিশিষ্ট প্রমাণসহকৃত পরিগীত প্রয়োগ,; যা পূর্বে সাধিত হয়নি। প্রমাণ যথা

ছন্দঃ প্রমাণসংযুক্তং দিব্যানাং গানমিষ্যতে
স্তুত্যাশ্রয়েণ তৎ কার্যং কর্মসংকীর্তনাদপি ॥ ৪১৩ ॥ ৩২ অঃ।

"দিব্যানাং" অর্থ দিব্য গন্ধর্বকিন্নরাদি ভূমিকাধারী পাত্রপাত্রীগণের। ছন্দঃ প্রমাণাদি বিধি ৩২ অঃ ৪১০ শ্লোক থেকে ৪২৬ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে উপদিষ্ট হয়েছে। এই ভাবে "উদাত্ত গানে গন্ধর্বৈঃ পরিগীতৈঃ প্রমাণতঃ বাক্যস্থ "প্রমাণতঃ" শব্দের বিশিষ্ট তাৎপর্য উদ্ধরনীয়।

কোনও ভাবী কালের ভারতে যদি সংস্কৃত ভাষা ও আদর্শ অবলম্বন করে নাট্যানুরাগী প্রযোক্তৃবৃন্দ (ভি. আই. পি.,র দল নয়!) নাট্যপ্রচেষ্টা করেন, এবং ইউরোপীয় বেদ-বিধি ত্যাগ করে ভারতীয় নাট্যাদর্শের প্রতি আস্থাবান হন, এবং উত্তম সুনির্বাচিত নাটক (আধুনিক "নাটক" নামধেয় বস্তু নয়) বা প্রকরণকে নাট্যে রূপায়িত করতে মনোযোগী হন, তাহলে, বিশেষ করে চিত্র পূর্বরঙ্গ কর্মের উপদেশাবলী প্রতি অভিনিবেশ করবেন, আশা করা যায়। তবে, এরূপ আত্ম-সম্ভ্রম যতদিন পর্যন্ত জাগরিত না হচ্ছে, ততদিন অবশ্যই "মরা গরু ঘাসই খায় না, তার আবার তাজা-শুকনো" ইতি মনে করে যা' হয় একটা কিছু করা ব্যতীত গত্যন্তরও দেখিনে।

অতঃপর বলা হয়েছে —

শুষ্ধাঃ কুসুমমালাশ্চ বিকিরেয়ুঃ সমন্ততঃ।
অঙ্গহারৈশ্চ দেব্যস্তা উপনৃত্তেয়ুরগ্রতঃ ।।

অন্বয় ব্যাখ্যা। দেবদুন্দুভিনিনাদৈঃ পুরস্কৃত্য এব রঙ্গপীঠোপরি সম্প্রতি দিব্যজনসুলভং নৃত্তকর্ম অপি কার্যং তদ্ যথা। শুষ্ধাঃ (সমুজ্জ্বলাঃ) কুসুমমালাশ্চ সমন্ততঃ (চতুর্দিশতঃ) বিকিরেয়ুঃ (রঙ্গপীঠোপরি তাদৃশপুষ্পমালাবিক্ষেপং কুর্যাদ্ ইতি) অপি (অধিকন্তু) তা দেব্যঃ (পূর্বোক্তানাম্ এব গন্ধর্বাদীনাং গণানাম্ যাঃ স্ত্রিয়ঃ পুনরপি উর্বশীপ্রমুখাঃ যাঃ দেবাঙ্গনাঃ পরিণামনাট্যে দিব্যনৃত্তানি আচরিষ্যন্তি তাঃ এব দেব্যঃ ইতি) অঙ্গরাঃরৈঃ (তন্ডুপ্রবর্তিতনৃত্তকরণবিশেষৈঃ শৃঙ্গারোদ্ভাবকৈঃ ইতি অত্র বিশেষঃ) অগ্রতঃ প্রেক্ষকবিশেষাণাম্ অগ্রতঃ উপনৃত্তেয়ুঃ (চার্যাদেঃ প্রয়োগঃ উপনৃত্তঃ ইতি অত্র শৃঙ্গারোচিতম্ উপনৃত্তং কুর্যুঃ ইতি শেষঃ)। অত্র দুন্দুভিবাদন চ কুসুমমালা প্রক্ষেপঃ তাসাম্ এব দিব্য নর্তকীনাম্ উৎসাহবর্ধনায় অপি ভবতঃ ইত্যভিসন্ধেয়ম।

অনুবাদ। অতঃপর রঙ্গপীঠের উপরে সমুজ্জ্বল কুসুমমালা সকল বিক্ষেপ করা উচিত। এবং নর্তকীগণের মধ্যে যাঁরা সম্ভাব্য নাট্যে দিব্যস্ত্রীভূমিকায় নৃত্ত করবেন, মাত্র সেই নৃত্তকুশলা

ভরতমুনির সর্ব প্রয়োগোপদেশের নির্গলিত সার কথা ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করে বলা যায় "এনি থিং ওয়ার্থ ডুইং ইজ্ ওয়ার্থ ডুইং ওয়েল্"। আজকের কালে সাধারণ "ফরমুলা" হল "এনি থিং ডুইং ইজ্ ওয়ার্থ ডুইং এনি হাউ অ্যাট্ শর্ট নোটিস্"।

দেবীগণ প্রেক্ষকবর্গের সম্মুখে অঙ্গহার প্রয়োগ পূর্বক উপনৃত্ত করবেন।

তাৎপর্য। ব্যাপারটি চিত্র কর্মাবসরে দিব্য শৃঙ্গারনৃত্তেরই প্রয়োগ ও পরীক্ষা। প্রসঙ্গত, সমস্ত নৃত্তকর্ম প্রযোজ্য নয়; পরন্তু, যে অংশটি 'উপনৃত্ত' শব্দ দ্বারা সূচিত, মাত্র সেই অংশই প্রযোজ্য। 'নৃত্ত' ও 'উপনৃত্ত' শব্দের অর্থে পার্থক্য আছে। 'উপ' শব্দ দ্বারা সাধারণ আরম্ভ এ স্থলে অভিপ্রেত হয়েছে।

প্রশ্ন হতে পারে, পূর্বরঙ্গে না হয় যেদিক্ সেদিক থেকে পুষ্পমালা নিক্ষেপ করা যেতে পারে। কিন্তু, সম্ভাব্য নাট্যে কিরূপে, কোন্ দিক থেকে পুষ্পমালা বর্ষণ হবে?

উত্তরে বলা যায়—নাট্যশাস্ত্রীয় নিকৃষ্ট নাট্যগৃহ পক্ষে উক্ত প্রকার আনুষঙ্গিক প্রয়োগের নিমিত্ত যথেষ্ট ব্যবস্থা উপদিষ্ট হয়েছে। সংক্ষেপে (১) রঙ্গপীঠের উপরিভাগ উন্মুক্ত (২) রঙ্গপীঠ নেপথ্যের যৌগিক ভিত্তিতে যথেষ্ট বাতায়ন-ব্যবস্থা আছে, এবং (৩) রঙ্গমার্গদেশের যৌগিক ভিত্তিতে যথেষ্ট বাতায়ন ব্যবস্থা আছে। সম্প্রতি এর বিশদ প্রসঙ্গ হতে পারে না। রঙ্গ-পীঠের ঊর্ধ্বদেশ থেকে, তথা বাতায়ন-দ্বার দিয়ে পুষ্পমালা-নিক্ষেপ ব্যবস্থা আদৌ কঠিন নয়।

অতঃপর চিত্র পূর্বরঙ্গে অনুষ্ঠেয় বিশিষ্ট প্রকার দিব্যনৃত্তবিধি উপদিষ্ট হয়েছে। এ স্থলে কা-সং ১৫৭-১৫৮ শ্লোক অবলম্বন করেছি।

যস্তান্ডবিধিতো প্রোক্তো নৃত্তে পিন্ডী সমন্ততঃ।
রেচকৈরঙ্গহারৈশ্চ ব্যাসাপন্যাসযুতঃ ।।
নান্দীপদানাং মধ্যে তু একৈকস্মিন্ পৃথক্ পৃথক ।।
প্রযোক্তব্যো বুধৈঃ সম্যক্ চিত্রভাবমভীপ্সুভিঃ ।।

এতৎ সমস্ত একটি শ্লোকরূপে গণ্য। এই শ্লোকের অর্থ। পূর্বে তান্ডববিধিগত নৃত্তাধিকারে পিন্ডীবন্ধ নামধেয় নৃত্তবিশেষ উপদিষ্ট হয়েছে। সমন্ততঃ অর্থাৎ চতুর্দিকে সম্ভরমান, রেচক-অঙ্গহারসহকৃত, ও ব্যাস-অপন্যাসসংযুক্ত সেই পিন্ডীবন্ধ নৃত্তের এক-একটি করে **নান্দী-গেয় পদ** সকলের মধ্যে সম্যক রূপে প্রয়োগ করা বিধেয়। যে সকল নাট্যবিবুধ প্রযোক্তাগণ চিত্রপূর্বরঙ্গের ভাব-বস্তুর প্রয়োগ কামনা করেন তাঁরা এই রূপেই প্রয়োগ করবেন।

তাৎপর্য। "চিত্রভাবমভীপ্সুভিঃ এব বুধৈঃ প্রযোক্তব্যঃ" বাক্যের তাৎপর্য এই যে সম্প্রতি যদিও চিত্রপূর্বরঙ্গ মাত্রের প্রসঙ্গ বর্তিত হচ্ছে এবং প্রযোক্তাগণ অবশ্যই তান্ডব বিধিগত নৃত্ত পরীক্ষা করবেন এরূপ মনস্থ করেছেন, তাহলেও, বিশেষ উপদেশ এই যে এই পিন্ডীবন্ধ নৃত্তের প্রয়োগ পরীক্ষা ব্যাপারে (১) সুবিধা অনুসারে অপর পর্যায় সকলের মধ্যে যখন সুবিধা তখন প্রয়োগ করা যায়, **কিন্তু** সুবিধা যখনই হক, প্রয়োগগুলি সর্বথা (২) **নান্দী গেয়পদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট থাকবে** এবং (৩) এক একটি নান্দী-গেয় পদের পরেই এক এক বার নৃত্ত প্রয়োগ করা উচিত।

কি হেতু পিন্ডীবন্ধের সঙ্গে নান্দীর এই লতাবন্ধ সংশ্লেষ! পরিণাম নাট্যেও শৃঙ্গারভাবকে পিন্ডীবন্ধের প্রয়োগ এই ভাবেই বিধেয়; এই হেতুতে। পরিণাম নাট্যেই বা পিন্ডীবন্ধ নৃত্তের সঙ্গে নান্দী গেয় পদের সংশ্লেষের হেতু কি?

"চিত্রভাবমভীপ্সুভিঃ" বাক্যের তাৎপর্যের মধ্যে এই হেতু প্রচ্ছন্ন আছে। পিন্ডীবন্ধ নৃত্ত স্ত্রীপুরুষ-যুগল বন্ধ নৃত্ত বিশেষ। ভরতপূর্বকালীন সমাজে **ঐরকম উৎসব-নৃত্ত বা আনন্দ-**

নৃত্ত প্রবর্তিত ছিল।* সুতরাং নাট্যের মধ্যেও এর সমুচিত স্থান ছিল ("নাট্যং লোক-স্বভাবজম্")। সেই লৌকিক পিণ্ডীবন্ধ নৃত্ত লৌকিক ভাব সকলের পরিচায়ক ছিল সন্দেহ নেই। সুতরাং—মানুষী সিদ্ধির অর্পোক্ষিত নাট্যে তথা তাদৃশ নাট্যের প্রস্তুতির উপযুক্ত "শুদ্ধ" পূর্ব-রঙ্গে "শুদ্ধভাবম্ অভীপ্সুভিঃ" প্রযোক্তাগণ এর সঙ্গে গূর্বাচার সিদ্ধ দিব্যভাবগূঢ় নান্দী-গানের সহযোগ বাঞ্ছনীয় মনে করতেন না।

কিন্তু, দৈবিকী সিদ্ধির প্রত্যাশাসূচক নাট্যে দিব্য-দেব-দেবতাগণের পক্ষে প্রযোজ্য সর্বোত্তম ও অলৌকিক-আশ্চর্যভাবযুক্ত পিণ্ডীবন্ধ নৃত্তের প্রয়োগ অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। সুতরাং—চিত্রভাব সমন্বিত পূর্বরঙ্গ বিধির প্রসঙ্গ ও অনিবার্য। এখন কথা এই যে—যুবক-যুবতীর দেহ-সংশ্লেষ ও ঘটতে বাধ্য। "শুদ্ধ" পূর্বরঙ্গে বা মানুষী সিদ্ধির পক্ষে এরকম ঘটনা নাট্যের বা নাট্যপ্রস্তুতির বিঘ্নকারক নয়। কিন্তু চিত্র পূর্বরঙ্গে ও দৈবী সিদ্ধির পক্ষে এরকম ঘটনা নাট্যা-দর্শকে ক্ষুন্ন করতে পারে। এই সম্ভাবনা নিবারণার্থে নৃত্তকারী স্ত্রীপুরুষগণের হার্দ্দিক পরি-বেশ সৃষ্টি করা উচিত। **একমাত্র নান্দীগানই এই পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে, অথবা পারত।** কারণ নান্দীগান স্বয়ং দিব্যভাবগূঢ় গীতবস্তু বিশেষ।

পিণ্ডীবন্ধ নৃত্ত

চৌ-সং ৪ অঃ ২৪৯ শ্লোক থেকে ২৫৬ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে 'পিণ্ডীবন্ধ' নৃত্তের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। পুনরায় প্রসঙ্গান্তরে ঐ অধ্যায়ে ২৬৪ শ্লোক থেকে ৩২১ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে বিধি উপদিষ্ট হয়েছে। এই স্তরে ২৭৬ শ্লোক থেকে ২৭৮ শ্লোকে এবং ২৪৩ শ্লোক থেকে ২৮৭ শ্লোকে পিণ্ডীবন্ধ নৃত্তের সবিশেষ অথচ সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ আছে।

সম্প্রতি, এস্থলে তাণ্ডব ও পিণ্ডীবন্ধ নৃত্তের পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রসঙ্গ করা যাবে না। তবে, সাধারণ ভাবে ও সংক্ষেপে বলা যায় (১) তাণ্ডব নৃত্ত দ্বিবিধ, যথা সুকুমার তাণ্ডব ও উদ্ধত তাণ্ডব; (২) প্রত্যেক তাণ্ডবই অঙ্গহার-রেচক নামে প্রয়োগের অধীন (৪ অঃ ১৮-১৯ শ্লোক থেকে ২৪৫ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে); (৩) তাণ্ডব নৃত্তের চারী-মহাচারী কর্ম, ও পিণ্ডী-বন্ধ নৃত্তের গতি-প্রচার কর্ম সম্বন্ধে সপ্রমাণ মণ্ডলাকৃতি স্থান, তার ব্যাস (ন্যাস নয়) ও অপ-ন্যাস নির্ধারিত; (৪) পিণ্ডীবন্ধ নৃত্ত স্বয়ং চার প্রকার, যথা—একৈক বহু, যুগলসংশ্লিষ্ট বহু, ত্রিযুক্তবহু এবং চতুষ্টয়-যুক্ত-বহু ভেদ এবং (৫ প্রতি নৃত্তের সঙ্গে আসারিত *ভাণ্ড-বাদ্য প্রয়োগ বিহিত।

সার সত্য কথা এই যে, পিণ্ডীবন্ধ নৃত্ত=গ্রুপ্ ডানস্, ওয়ালশ ডানস! কিন্তু প্রশ্ন এই যে ইউরোপীয় নাট্যবেদ বা নাট্য-ইতিহাসে গ্রুপ-ডান্স্ বা ওয়াল্শ্ কবে থেকে প্রচলিত হয়েছিল! কোনও খৃষ্টপূর্ব ইউরোপীয় নাট্যশাস্ত্র ছিল কি? যদি থাকে, তার মধ্যে উক্ত বিষয়ে সিদ্ধি, প্রয়োগ-বিধি, প্রমাণ-লক্ষণ ঘটিত উপদেশ আছে কি? *

* ভারতের ইতিহাসে (অবশ্যই যীশুখৃষ্ট জন্মগ্রহণের পূর্বে) কোন্ বিশিষ্ট কালে ভারতীয় সমাজের যুবক-যুবতীবৃন্দ উৎসব উপলক্ষে এরকম পিণ্ডীবন্ধ নৃত্ত সমাচারণ করতেন, এ বিষয়ে সতর্ক গবেষণা না করেই নাট্যশাস্ত্র-রচনার কালকে খৃষ্টজন্মের পরে প্রকর্ষণ করা নিতান্তই পরের মুখে ঝাল-খাওয়া।

* আধুনিক গবেষকবৃন্দ উত্তর দিয়েছেন, যথা। যে হেতু গ্রীক-রোমীয় খৃষ্টপূর্ব সংস্কৃতির ইতিহাসে নাট্যবেদ বা নাট্যশাস্ত্র পাওয়া যাচ্ছে না, অতএব ভরত মুনি বা নাট্যশাস্ত্র রচনার কাল কদাপি খৃষ্টপূর্ব কোনও যুগে স্থাপনা করা হবে না!' প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রদ্ধায় এমন সুন্দর "হরিবোল" ধ্বনি আর আছে কি না সন্দেহ!

আপাতত, চিত্র পূর্বরঙ্গ ঘটিত উপদেশ এই যে চিত্র পূর্বরঙ্গে নৃত্তের উপক্রমণিকার পরেই বিধিদিষ্ট তাণ্ডব ও পিণ্ডীবন্ধ নৃত্তের প্রয়োগ ও পরীক্ষা কর্তব্য। বৈশিষ্ট্য এই যে নান্দীগানের মধ্যে মধ্যে নৃত্তকারী স্ত্রীগণ ও পুরুষগণ এক-দ্বি-ত্রি-চতুর্যোগে পরম্পরায় নৃত্ত করবেন। রেচক-অঙ্গহার যুক্ত নৃত্ত পক্ষে ন্যূনকল্প প্রয়োগ সৌষ্ঠব পরীক্ষার্থে প্রত্যেক নৃত্ত-কারীর চারী কর্ম ব্যাস (ইং ডয়ামিটার) ও অপন্যাস (কালমাত্রাগত যতি বিশেষ) দ্বারা নির্ধারিত হবে। ব্যাসের নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা এই যে—যুগলবদ্ধ নৃত্তকারীরা যেন সীমা লঙ্ঘন করে পরস্পর থেকে বিশ্লিষ্ট না হয়। অপন্যাসের প্রয়োজন যথা, (রেচক কর্ম সকল যুগপৎ এক কালে স্তব্ধ যতিযুক্ত হয়। পিণ্ডীবন্ধ নৃত্ত বহু সম্মিলিত রমণীয় ও অদ্ভুত দৃশ্য। এর মধ্যে সম্মেলন ও রমণীয়তাই সর্বপ্রথমে পরীক্ষণীয়। এর চিত্রত্ব অর্থাৎ অদ্ভুতত্ব নাট্যস্থ অক্ষের ঘটনা-পরিবেশের অধীন এবং ব্যাপারটি স্বয়ম্প্রকাশ সাধ্য, সুতরাং পরীক্ষণীয় হতে পারে না। এতৎ প্রসঙ্গে ৪ অধ্যায়ে ২৭৬ শ্লোকোক্ত বিধি যথা—

অনেনৈব বিধানেন প্রবিশন্ত্যপরাঃ পুনঃ।
অন্যাশ্চানুক্রমেণাথ পিণ্ডীং বধ্নন্তি তাঃ স্ত্রিয়ঃ ।। ২৭৬ ॥ ৪ অঃ।

অর্থাৎ, উল্লিখিত বিধানে, প্রথমে এক এক দল নর্তক প্রবেশ করেন ও নৃত্ত করেন। তদনুক্রমে অন্য নর্তকীগণ একে একে প্রবেশ করেন এবং পূর্বাবিভূত নৃত্তকারীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে পিণ্ডীস্তবকসকল গ্রথিত করেন।

তাৎপর্য। পূর্বরঙ্গীয় পরীক্ষার্থে "একের পরে অন্যের প্রবেশ ও পরীক্ষা" ইতি সুবি-ধান। এক সঙ্গে উৎসধারা ন্যায়ে প্রবেশ ও নৃত্ত প্রয়োগের কদাপি পরীক্ষা হতে পারে না।* পক্ষান্তরে, পরিকল্পিত ভাবী নাট্যকর্মে পরীক্ষা বলতে ব্যাপার নেই; সুতরাং, নাট্য কর্ম কালে এই বিধি পালনীয় নয়। অতঃপর, ঐ অধ্যায়ে ২৭৭ শ্লোক —

তাবৎ পর্যস্ততঃ কার্যো যাবৎ পিণ্ডী প্রযুজ্যতে।
পিণ্ডীং বধ্ধা ততঃ সর্বা নিষ্ক্রামেয়ুঃ স্ত্রিয়স্তু তাঃ ।।

অর্থাৎ। যে পর্যন্ত একের পর একটি করে নৃত্তস্তবক গ্রথিত হতে থাকবে, সে পর্যন্ত পর্যস্ততঃ (পর্যায়বন্ধ ক্রমে) প্রয়োগ নিষ্পাদনীয়। অতঃপর নৃত্তক্রমে সমগ্র পিণ্ডীবন্ধ সাধিত হলে, কিন্তু, সর্বনর্তকীগণ যুগপৎ (একের পর এক নয়) রঙ্গপীঠ থেকে নিষ্ক্রান্ত হবেন।

নর্তকগণ অপেক্ষা করবেন। কি হেতু? যে ক্ষেত্রে উদ্ধত তাণ্ডব প্রয়োগ ব্যপদেশে চারী-মহাচারীর প্রয়োগ-পরীক্ষা কর্তব্য, এবং বর্ধমানক যোগ ও অনুষঙ্গ রূপে প্রযোজ্য, সে ক্ষেত্রে নর্তকীগণ নিষ্ক্রান্ত হলেও নর্তকবৃন্দ অপেক্ষা করবেন। নাটক-প্রকরণাশ্রিত নাট্যে মহে-শ্বর-লীলা থাকে বলেই চিত্রপূর্বরঙ্গে মহাচারী-বর্ধমানক যোগ সকল প্রযোজ্য ও পরীক্ষণীয়।

এই হল ৪ অধ্যায়ে উপদিষ্ট পিণ্ডীবন্ধ প্রয়োগ-বিধির সংক্ষিপ্ত সার। অতঃপর, ৫ অধ্যায়ে বক্ষমান দুটি শ্লোকে উক্ত বিধির বিশিষ্ট অনুবিধি লক্ষ্য হয়। চিত্র পূর্বরঙ্গ পক্ষে,

এবং কৃত্বা যথান্যায়ং শুদ্ধং চিত্রং প্রযুক্তত।
ততস্ত্বতর্হিতা সর্বা ভবেয়ুর্দিব্য যোষিতঃ ॥ ১৫৬ ॥ ৫ অঃ।

অন্বয়ব্যাখ্যা। এবং যথান্যায়ং (যথোপদিষ্টং) শুদ্ধং (মানুষীসিদ্ধি-লক্ষ্যং যদ্বা

* গ্রাম্য বিদ্যালয়ে স্কুল-ইন্স্পেক্টরের পাঠগৃহে প্রবেশ মাত্রই ছাত্রদের এক-যোগে দড়বড় করে আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে-ওঠা, অথবা নামতা মুখস্ত কালে "গণ্ডায় এণ্ডা দেওয়া" ব্যাপারের মতো ব্যাপার এই পিণ্ডীবন্ধ প্রয়োগ-পরীক্ষা নয়। তবে, আধুনিক নাটক-নাট্যের, তথা দর্শকদের একটি বিশেষ সুবিধা এই যে পিণ্ডীবন্ধ নৃত্ত ব্যাপারটিই বর্জন করা হয়! এ থেকে সুবিধা আর কি হতে পারে!

চিত্ররঙ্গানুষঙ্গিকম্ এব মর্ত্যভূমিকা নিষ্ঠাং নৃত্তং শুদ্ধপূর্বরঙ্গাধিকারত্বাৎ তন্নৃত্তকর্ম শুদ্ধাখ্যং ভবেদ ইতি) পুনঃ চিত্রম্ (আলোচ্যমানমেব চিত্রপূর্বরঙ্গ) প্রযত্নতঃ কৃত্বা (অবহিত চেষ্টায়া নিষ্পাদ্য অত্র পিণ্ডীবন্ধস্যৈব প্রসঙ্গঃ ইতি) তদনন্তরং সর্বা দিব্য যোষিতঃ (দিব্য নৃত্তভূমিকা নিষ্ঠাঃ এব সকলাঃ পাত্র্যঃ) অন্তর্হিতা ভবেয়ুঃ (রঙ্গাৎ নিষ্ক্রামেয়ুঃ পরীক্ষাসমাপ্তেঃ হেতোঃ ইতি শেষঃ)। পরবং তত্র অবতিষ্ঠন্তি ইতি অবগন্তব্যম্।

অর্থ। এইরূপে যথান্যায় শুদ্ধ ও চিত্র নৃত্তকর্ম সম্পাদিত হলে দিব্যযোষিদ্‌বৃন্দ (দিব্যভূমিকাধারী নর্তকীবৃন্দ) রঙ্গপীঠ থেকে এক যোগে নিষ্ক্রান্ত হবেন। অর্থাৎ পরীক্ষা-দান সমাপ্ত হলে নিষ্ক্রান্ত হবেন।

প্রশ্ন হয়, চিত্র পূর্বরঙ্গ প্রসঙ্গে পুনরায় 'শুদ্ধ' পূর্বরঙ্গীয় কর্মের উল্লেখের হেতু কি? হেতু এই যে—এমন কোনও দৈবীকী সিদ্ধির অপেক্ষিত নাট্য পরিকল্পনীয় নয়, যার মধ্যে মানুষী পরিবেশ ও মানুষী নৃত্ত কর্ম একান্তই বর্জিত। সুতরাং চিত্র পূর্বরঙ্গীয় পরীক্ষার অবসরে মানুষী ভূমিকা লক্ষিত নৃত্তাদি কর্ম ও প্রযোজ্য।

সাম্প্রতিক উপদেশ এই যে, মাত্র দিব্য যোষিদ্‌বৃন্দই নিষ্ক্রান্ত হবেন। কিন্তু মনুষ্য-ভূমিকায় নর্তনকারিণী স্ত্রী সকল এবং সর্ব ভূমিকাধারী পুরুষ নর্তকগণ রঙ্গপীঠে অবস্থিত হবেন। কারণ, মানুষীনৃত্তকলা এবং তাণ্ডবাদি সমন্বিত পুরুষ নৃত্ত ও অবশিষ্ট আছে।

অতঃপর বলা হয়েছে, নিষ্ক্রান্তাসু চ সর্বাসু নর্তকীষু ততঃপরম্।

পূর্বরঙ্গে প্রযোক্তব্য মঙ্গজাতমতঃ পরম্ ॥ ১৫৭ ॥ ৫ অঃ।

অর্থাৎ। দিব্যভূমিকানিষ্ঠ পাত্রীগণ পূর্বেই নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন। পর পরে, মনুষ্যভূমিকা-নিষ্ঠা সর্ব পাত্রীগণ যথাপ্রযোজ্য নৃত্তপ্রয়োগ করে নিষ্ক্রান্ত হন। রঙ্গপীঠে মাত্র পুরুষ নৃত্ত-কারীগণ অবশিষ্ট থাকেন। অতঃপর, এঁরা চিত্র পূর্বরঙ্গে প্রযোজনবিহিত অঙ্গজাত কর্ম প্রয়োগ করেন।

অঙ্গজাত কর্ম অর্থাৎ প্রত্যঙ্গ-কর্ম। নৃত্তই অঙ্গ; চারী হল অঙ্গ-কর্মেরই বিভাগ। কিন্তু অঙ্গজাত বা প্রত্যঙ্গ কর্ম হল মুখ্যত মহাচারী ও বর্ধমানক যোগ। গৌণতঃ ব্যায়ামবিশেষ চারীর প্রত্যঙ্গকর্ম স্বরূপ (১১ অঃ চারী বিধান, তন্মধ্যে, ২ শ্লোক এবং ৮৬ শ্লোক থেকে ১০০ শ্লোকান্তরে ব্যায়াম-সংজ্ঞা প্রযোজন, ও প্রযোগবিধি)। **এই ব্যায়াম অঙ্গ-সৌষ্ঠবতা প্রকাশক এবং লয়তালসমন্বিত।** নাট্যের মধ্যে ব্যায়াম-চারীর * (ইং ড্রিল্, প্যারেড্) দৃশ্য থাকতে পারে, অবশ্যই। কারণ, বীর ও অদ্ভুত রসের মৌলিক উৎসাহ ও চমৎকৃতির ছটা ব্যায়াম-চারীর মধ্যেও অভিব্যক্তি লাভ করে। অধিকন্তু, "নাট্যং লোকস্বভাবজম্" অতএব, চিত্র পূর্ব-রঙ্গে ব্যায়াম-চারীর প্রয়োগ-পরীক্ষা আবশ্যক।

এইরূপে ও এই স্থানে 'চিত্র' নামে সমস্তমত ও কঠিনতম পূর্বরঙ্গীয় প্রয়োগ-পরীক্ষা সমাপ্ত হল। সমাপ্ত হওয়ার অর্থ মনোনীত হওয়া নয়। কর্মের দোষ-ত্রুটি থাকতে পারে।

* ভরত মুনির কালে তাহলে লয়তাল যোগে ব্যায়ামও ছিল! গ্রীক মল্লবিদ্‌গণের নিকটে ধার করা বিদ্যা নয়ত! এবং, ব্যায়াম-চারীও ছিল! খুবই আশ্চর্যের কথা সন্দেহ নেই। আমাদের ধারণা (পরের মুখে ঝাল খেয়ে) ছিল যে প্রাচীন কালের সংস্কৃতি বলতে হয় নাদ-ব্রহ্মের উপাসনা, না হয় উপনিষদের ব্রহ্মগবেষণা, কিম্বা দিনরাত সামগান-মন্ত্র-যজ্ঞই ভারতীয় জীবনকে ইহ বিমুগ্ধ করে রেখেছিল! উপনিষদ (বিশেষত ছান্দোগ্য), পুরাণ সকল নাট্যশাস্ত্র, রামায়ণ ও মহাভারত পড়ে পরোচ্ছিষ্ট বস্তুর স্বাদ ধুয়ে ফেলেছি।

বিশিষ্ট প্রেক্ষক-মীমাংসকবর্গ পরিশেষ ব্যাপার সকল বিচার-মীমাংসা করে পূর্বরঙ্গীয় সফল-তার নাট্যযোগ্যতা সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করেন। বিচার-মীমাংসার ক্রমযুক্ত আদর্শ-প্রমাণ ২৭ অঃ ৯৬ শ্লোক থেকে ১০১ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে বর্ণিত হয়েছে। আমি পূর্বেই এর আলোচনা করেছি। মনোনীত না হলে পুনরায় পূর্বরঙ্গীয় অনুষ্ঠান করা উচিত মনে করা হয়েছিল। এই স্তরের প্রযোগ-পরীক্ষা ব্যাপারকে "শেষ-প্রয়োগ" বলা হয়েছে।

পূর্বরঙ্গ সমাপ্তি

সাধারণ ও বিশেষ বিধি অনুগমনপূর্বক শুদ্ধ, চিত্র ও মিশ্র পূর্বরঙ্গের আচরণীয় সর্বাঙ্গীন কর্ম সাধিত হলে, 'পাত্র' 'প্রয়োগ' "সমৃদ্ধি" ও "অলংকার" নামে আখ্যাত গুণ-লক্ষ-ণের (২৭ অঃ ৯৬ শ্লোক থেকে ১০১ শ্লোক) পরীক্ষা কর্তব্য। সাধারণভাবে নাট্যসংসদ এবং বিশেষ ভাবে প্রেক্ষক-প্রাশ্নিক-মীমাংসকবর্গ উক্ত চরম পরীক্ষা করেন।

পরীক্ষান্তে পূর্বরঙ্গ কর্ম মনোনীত হওয়া মাত্রেই পূর্বরঙ্গ সমাপ্ত হল। **ইতি নাট্য-শাস্ত্রীয় পূর্বরঙ্গ-সমাপ্তি।**

যোগসাধক কর্ম

পূর্বরঙ্গের সমাপন ও পরিকল্পিত নাট্যের আরম্ভ এই দুইএর মধ্যে কিছু সন্ধিকর্ম অবশিষ্ট ও আবশ্যক। সন্ধিকর্মে নট-নটী প্রভৃতি শিল্পীরা তদ্‌রূপে অংশ গ্রহণ করেন না। কিন্তু কোনও শিল্পী যদি অধিকন্তু নাট্যসংসদের সভাপদে প্রতিষ্ঠিত হন, তাহলে তিনি সন্ধিকর্মেও অংশ গ্রহণ করতে পারেন।

সন্ধিকর্ম দুই ভাগে সাধিত করার ব্যবস্থা উপদিষ্ট হয়েছে। প্রথম, নাট্যপ্রয়োগের কাল নির্ণয়ের পূর্বে **"স্থাপক"** পদবাচ্য কোনও সংসদ্ সভ্য একটি অধিবেশনে নাট্যপ্রস্তাবনা করেন। প্রস্তাবনার অবসরে সেই নাটকাদি রচয়িতা কবির গুণানুকীর্তন করা বিধেয়। যে বিশিষ্ট কাব্য (নাটকাদি দশরূপ কাব্যবন্ধের অন্যতম ইতি কাব্য) নাট্যে প্রতিফলিত করা হবে, সেই কাব্যের বিষয়, বস্তু বৈশিষ্ট্য, রস-লক্ষণ, অঙ্ক-সন্ধি-বীজ-বিন্দু-পতাকাদির সমাবেশ, এবং অভিলষিত দৈবিকী প্রভৃতি সিদ্ধির কামনা সকল নিবেদিত ও আলোচিত হয়। ৫ অঃ ১৬৪ শ্লোক থেকে ১৭০ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে এই 'স্থাপনা' উপদিষ্ট হয়েছে।

স্থাপক পুরুষটি কে? বলা হয়েছে "স্থাপকঃ প্রবিশেৎ তত্র সূত্রধারগুণাকৃতিঃ ॥ ১৬৪ শ্লোক। অর্থাৎ, সূত্রধারের গুণের তুল্য গুণ, এবং লক্ষণের তুল্য লক্ষণ সম্পন্ন কোনও সংসদ সভ্য প্রয়োগী পুরুষ 'স্থাপনা' কর্ম সাধিত করেন। এস্থলে আকৃতি অর্থ লক্ষণ (৩৬ অঃ)। "সূত্রধারগুণাকৃতিঃ" বলার তাৎপর্য এই যে সূত্রধার অথবা সূত্রধার তুল্য কোনও ব্যক্তি স্থাপন-কর্ম করেন। "আচার্যগুণলক্ষণঃ" বললে কি ক্ষতি ছিল? "আচার্যগুণলক্ষণঃ" বললে ছন্দোরক্ষা হয়; কিন্তু অভিপ্রায় রক্ষা হয় না। কারণ, পরিকল্পিত নাট্যের বিভিন্ন অঙ্গাদির স্থাপন কল্পে গান্ধর্ব (গীত-বাদ্য-নৃত্ত) যোজনাও সংসদের পক্ষে বিচার্য। **"স্থাপনা" অর্থে 'তা' মাত্র কাব্য-স্থাপনা নয়; স্থাপনা অর্থে নাট্যস্থাপনা ও অবশ্য গ্রাহ্য।*** গান্ধর্ব-যোজনা পক্ষে সূত্রধারণ শ্রেষ্ঠ; আচার্য নয়। অতএব, এই স্থাপনা-স্থাপক প্রসঙ্গে 'সূত্রধার' নামোল্লেখ সার্থক।

* 'সাহিত্য দর্পণ' রচয়িতা ও টীকাকারগণ কাব্য সম্বন্ধে এতই অভিনিবিষ্ট যে, নাট্যের প্রতি অঙ্গে গান্ধর্ব-যোজনা থাকতে পারে, এবং এই ব্যাপার সকল "স্থাপনা" অবসরে সংসদ্ কর্তৃক সমালোচিত হতে পারে ও হওয়া উচিত, এই নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথা ভুলে গিয়েছেন।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রগতিধারা

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

সাহিত্যের পর্য্যায়ে কথাসাহিত্য কাব্য ইতিহাস বিজ্ঞান সংগীত ইত্যাদি সকল বিষয়ই সমান আসনের দাবী রাখে। আমরা অনেক সময়ে কথাসাহিত্যকেই সাহিত্যের পর্য্যায়ে স্থান দিয়ে থাকি। আর অন্য সব বিষয়কে আলাদা আলাদা সংজ্ঞা দেওয়া একরকম রেওয়াজ হোয়ে উঠেছে। ফলে বিজ্ঞান সাহিত্য কাব্যসাহিত্য ইত্যাদি এমন কি শিশুসাহিত্য পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন গোত্র নাম নিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীসমাজের আবির্ভাব হয়েছে সাহিত্য জগতে। কৌলিন্যের দাবী একমাত্র কথা-সাহিত্যের একেবারে, নৈকষ্য কুলীন, অর্থাৎ কুল পরিচয় ছাড়াই তার পূর্ণ পরিচয়।

সাহিত্যের জগতে এই কুলীন আর ভগের আবির্ভাব যে কবে সুরু হল বলা দুষ্কর। কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে এসে দাঁড়িয়েছে এই অবস্থায়। এই অবস্থা বলছি কেন, সাহিত্যের গণ্ডী সাধারণ ভাবে আরও কমে এসেছে। সাহিত্য বলতে উপন্যাসের বাইরে এমন কি গল্পকেও আসন দিতে কুণ্ঠা দেখা যায়। আমরা কিছু এই সংকীর্ণ গণ্ডী নিয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ করব না। আমরা সাহিত্য বলতে কথা-বিজ্ঞান-ইতিহাস সকল কুলীন অকুলীনকেই সমান আসনে বসাব। সুতরাং প্রগতির ধারা নিরূপণে ও আমরা কথা-কাব্য-বিজ্ঞান-ইতিহাস এমন কি কলা অর্থাৎ রেখাকেও বাদ দিব না। সংক্ষেপে কোন একটিও রেখাব্যঞ্জনাকে বাদ দিয়ে সাহিত্য-আলোচনা করা চলতে পারে বোলে আমরা বিশ্বাস করিনে। রেখা প্রকাশকে আমরা শিল্পকলা নাম দিয়ে অন্য পরিচয় দিতে পারি। কিন্তু এই রেখাম্বারা একটি সম্পূর্ণ ভাবভাবনা যে অভিব্যঞ্জিত হয় তা অনস্বীকার্য্য। তাই সেও সাহিত্য; সেও দেয় কিছু, প্রকাশ করে কোন একটা তত্ত্ব।

আসলে সাহিত্য সমাজের চলতি ভাব আর আদর্শের প্রকাশ। সমাজ জীবনে যখন যেই প্রগতি নিয়ে চলে মানুষ সংস্কার সংস্কৃতির পথে, তারই লিখিত রেখা প্রকাশ হল সাহিত্য। যেই যুগের সাহিত্য সেই যুগের সমাজ জীবনের ছাপ তাতে থাকতে বাধ্য। সেই হেতু সাহিত্য শিল্প কলা সবগুলোই সমকালীন সংস্কৃতির নিদর্শন নিঃসন্দেহে। ভবিষ্যতের ইঙ্গিত তাতে অবশ্য থাকে বা থাকা আবশ্যক। কিন্তু তাই বোলে অতীত অনাবশ্যক নয়। সোজাসুজি দেখতে গেলে অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালের সংগম সংহতির নামই সাহিত্য; যুগ সাহিত্য তার ঐতিহাসিক পরিচয়।

যথার্থপক্ষে মানুষ তো কোন সময়েই ঐতিহ্য ইতিহাস বাদ দিয়ে বাঁচতে পারে না। আবার বর্তমান মানুষের ভবিষ্যত পারিকল্পনার ভিত। আগেই বলা হয়েছে সাহিত্য সমকালীন ভাব ভাবনা আদর্শের লেখপ্রকাশ। তাই সাহিত্যের লক্ষ্য কল্যাণ।

সাহিত্য কল্যাণমুখী, তাই ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। সেই জন্যই সাহিত্য dynamic, সচল। সমাজ সংগঠনের চিহ্ন থাকে সাহিত্যের ভিত্তিমূলে ভবিষ্যত ভাবভবনার ইঙ্গিত থাকে সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে। সাহিত্য তাই সংস্কৃতির ধারক, প্রগতির বাহক তাই সাহিত্য। সাহিত্যের সংগে সেই হেতু সাহিত্যিক সমাজের গুরুদায়িত্ব বহন করে। আর এই কারণেই সমাজ প্রগতির একান্ত সহসহযাত্রী সমকালীন সাহিত্য। সাহিত্য সেই হেতুই সমসাময়িক সমাজ সংস্কৃতির ইতিহাস রক্ষা করে, তথা ভবিষ্যত অগ্রগতির নিশান করে উড্ডীন।

ইয়ুরোপীয় নবজাগরণ (রেনেসাঁস) পাশ্চাত্য ভাব-ভাবনা-আদর্শ-সংস্কৃতি তথা পাশ্চাত্য

সাহিত্যের পদধ্বনি নিঃসন্দেহ। আবার পাশ্চাত্য সাহিত্য সৃষ্টির অঙ্কুরও বলা যেতে পারে ইয়ুরোপীয় নবজাগরণ। কথাটা অনেকটা তৈলাধার পাত্রের রকম হোয়ে গেল-নয় কি? যথার্থই সম্বন্ধটাও ঠিক তাই কিন্তু। উভয়ই কিন্তু উভয়ের উপরে নির্ভরশীল। সাহিত্য প্রগতি সংস্কার সংস্কৃতির পুকার, কি-সাহিত্য যে কোন সংস্কার আন্দোলনের অনুরণন বলা কঠিন। বস্তুতঃ সংস্কার-প্রগতিহীন সাহিত্য, আবার সাহিত্যহীন সংস্কার কল্পনা করা কঠিন।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যও তেমনই ইয়ুরোপীয় সংস্কৃতির আগমনের পদধ্বনি নিঃসন্দেহে। ইংরেজী সাহিত্যের আবির্ভাব পুরাপুরি হয়তো ইতিহাস ও সরাসরি নথিপত্রের মাধ্যমে ঘটেছিল। কিন্তু নব্য বাংলা গদ্যের জন্ম বাইরের বাণী প্রচার প্রচেষ্টার ফলে। তখনকার পাদ্রিরা ধর্ম প্রচারের চেষ্টায় বাইবেলের বাণী সমূহ লোক সাধারণের বোধগম্য কোরে তুলবার জন্য অনুবাদ করতে সুরু করেছিলেন। এ'দের মধ্যে ডাঃ কেরী সর্বাগ্রগণ্য। কিন্তু ডাঃ কেরী ছিলেন ভাষাবিদ, জাত পণ্ডিত। তিনি দেখলেন সংস্কৃতভাষার অতল খনি থেকে চয়ন কোরে তদানীন্তন চলতি বাংলা ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ ও সুমধুর কোরে তোলা সম্ভব। তাঁর এই দুরূহ প্রচেষ্টায় সহকারী এবং সংগী পেলেন রামরাম বসুকে।

ডাঃ কেরী এতদ্বিষয়ে যেমন কুশলী তেমনই ছিলেন প্রজ্ঞাবান। রাম রাম বসুর প্রতিভা সেই সংগে যুক্ত হল। প্রথমে বাইবেলের সুসমাচার অনুবাদ সুরু করা হল বটে, কিন্তু তাঁদের পদচরণ ধর্মগ্রন্থ অনুবাদের গণ্ডী ছাড়িয়ে গেল; আর ছাড়িয়ে গেল অতি দ্রুত গতিতে। দুই-ই শ্রমাকুণ্ঠ কুশলীর যোগাযোগ হয়েছিল কিনা!

সংস্কৃত ব্যাকরণকে ভিত্তি কোরে বাংলা গদ্যরীতি তৈরী হল। এই গদ্যরীতি-ই ক্রমোন্নতির পথে বিকশিত হোয়ে বর্তমান বাংলা গদ্যসাহিত্যের পরিণতি। এই গদ্য রচনায় রাম রাম বসু প্রথম পুরুষ। রামমোহন সমসাময়িক হলেও পথিকৃতের দাবী নিঃসন্দেহে রাম রাম বসুর। এই গদ্যসাহিত্য প্রগতির পথে এগিয়ে চলল। এই প্রগতিশীল গদ্যসাহিত্যের জন্ম অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকের প্রান্ত সীমাতে। বছর ত্রিশের মত কেটে গেল শৈশব কৈশোর। তারপরে যৌবরাজ্যে প্রবেশ করল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতে। সৃষ্টি থেকে যৌবনে পদার্পণ করা পর্যন্ত ভাষার রীতি গতি মডিউলেশন ইত্যাদি নানাভাবে চলতে থাকে।

ঈশ্বরচন্দ্রের হাতে গদ্যসাহিত্যের উপনয়ন সংস্কার ঘটল। রচনা রীতি প্রকাশ ভংগী ইত্যাদি বিষয়ে নবতর ব্যাকরণের সৃষ্টি হল। অবশ্য তা যে রচিত ও লিখিত হল তা নয়। কিন্তু গদ্যরচনা নূতন শৈলীসম্ভারে সজ্জিত হল। এই রচনারীতি অনুক্ত ব্যাকরণের আশ্রয়ে প্রতিপালিত। ঈশ্বরচন্দ্রের গদ্য রচনার ধারাও রীতিতে ও ভাব প্রকাশনায় আবার নূতন রসে পরিপুষ্ট হল বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে।

বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক বাংলা উপন্যাস বা কথাসাহিত্যের জন্মদাতা। তাঁর প্রবন্ধের ভাষাও বিষয়ের অনুগ। রচনারীতির মধ্যে কিছুটা নূতনত্ব এনেছিলেন তিনি নিশ্চিত; কিন্তু ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের অবিকল। শব্দ চয়নও সংস্কৃত থেকেই বেশি করা হয়েছে। কয়েনিং বা নূতন শব্দ গঠনও তাই একমাত্র সংস্কৃত মূল থেকেই করা হয়েছে। অবশ্য কিছু কিছু দেশজ শব্দ যে ব্যবহার তিনি করেননি এমন নয়। তবে সে সকল শব্দগুলিকে সংস্কৃত ব্যাকরণের সহায়তায় যতটা সম্ভব পরিশুদ্ধ কোরে নেয়া হয়েছে। রচনা রীতিতে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম তিনি পারতপক্ষে লঙ্ঘন করেন নি। রচনারীতির জন্য গদ্যভাষার একটা নিজস্ব প্রকাশক্ষমতার সৃষ্টির মূলে যে বঙ্কিমচন্দ্র তাহা অনস্বীকার্য্য। তাঁর নূতন রচনারীতিতে বাংলা গদ্যে নবতর ধারা এবং নূতনতর গতি সঞ্চার করেছিল নিঃসন্দেহে। কিন্তু তাতে সংস্কৃত বহুল শব্দ অধিক পরিমাণে

ব্যবহৃত হওয়ায় তা সাধারণ-গ্রাহ্য হোয়ে ওঠে নি। তথাপি গদ্যসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহায্যে যুগাবর্ত ঘটেছিল।

পাশ্চাত্য রীতি অবলম্বনে লিখিত উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে কথাসাহিত্যের প্রথম আবির্ভাব। আধুনিক উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে, বাংলা সাহিত্যে কেন, সমগ্র প্রতীচ্যে এতাবৎ অজ্ঞাত ছিল। নতুন সংস্থাপনা হল পাশ্চাত্য উপন্যাসের ধাঁচে। মূলতঃ পাশ্চাত্য সাহিত্য ইউরোপীয় নবজাগরণের যুগ থেকে অনেক দিনে বহুমুখী বিকাশলাভ করেছিল। এই বিকশিত ইউরোপীয় সাহিত্যের সংস্পর্শ ভারতের ইউরোপীয় রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রবর্তনের সহিত ঐতিহাসিক সম্পর্ক। রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপনের ইতিহাস বঙ্গভূমে ইংরেজের প্রাধান্য বিস্তারের সংগে জড়িত। এখানে প্রশ্ন উঠবে ইংরেজের যোগসূত্রের আদি এবং মূল দাক্ষিণাত্যে—সুরাট, মালাবার, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থান।

সত্য কথা। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগ ইংরেজদের সুরু হল বাংলাতেই, এবং সেই যোগাযোগ বাণিজ্য স্বার্থকেও অতিক্রম কোরে গিয়েছিল। ক্রমে ব্যবসায়িক স্বার্থ-রাজনৈতিক স্বার্থের সহিত জড়িয়ে গেল। সেই হেতু বাংগালীর সমাজ রাজনৈতিক সংস্থা এবং ব্যবসায়িক স্বার্থের সংগে ইংরেজের একাত্ম হওয়া একান্ত স্বাভাবিক হোয়ে উঠল। যে কোন কারণেই ইংরেজের সংগে ভবিষ্যৎ পদযাত্রায় বাঙালী জড়িয়ে পড়ল। ফলে ইংরেজ-সংস্কৃতির প্রভাবও বঙ্গভূমিতে নিঃশব্দে বিস্তার লাভ করেছিল। তাই নবজাগরণের সময়ে সেক্‌স্‌পীয়রীয় সাহিত্য ধারার আবির্ভাব থেকে তৎকাল পর্যন্ত ইংরেজ সাহিত্যের যে বিকাশ হয়েছিল, তারই প্রভাব এসে পড়ল বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে। এই হল ইউরোপীয় সভ্যতার পদসঞ্চার বংগ প্রগতি তথা ভারতীয় অগ্রগতির যাত্রাপথে। বংগ তারে গল্পোদকে অভিষিক্ত কোরে নিয়েছিল, তাই বাংলাই এই নূতন সংস্কৃত-সাহিত্যের পথিকৃৎ এদেশে।

ইংরেজী সাহিত্যের মূল ছিল তার সমাজ জীবনের মাটিতে; সমাজ-মাটির রস নিয়েই পুষ্ট হয়েছিল ইংরেজ সাহিত্য। সাহিত্যসৃষ্টির মূলে তাই-এদেশেও সমাজজীবনই হল প্রধান উপজীব্য। সমাজ ও সামাজিক জীবন যাত্রাকে অবলম্বন কোরেই জন্ম নিয়েছিল বাংলার সাহিত্য নবযুগে। ঐতিহাসিক বিবর্তন সেই হেতু রাজনৈতিক জীবনে এনেছিল আমূল পরিবর্তন; এনেছিল সামাজিক জীবনে নবতর ভাবভাবনা। মোট কথা গোটা সমাজটার মধ্যেই এল সকল প্রকার জাগরণ।

কূপমণ্ডুক দেশ আমাদের। হঠাৎ নূতন দৃষ্টি লাভ করেছিল। সুজলাসুফলা বাংলা ছিল ভারতবর্ষের শস্য ভাণ্ডার। বাংলা তাই রাষ্ট্রনৈতিক চৌমাথায় পরিণত ছিল সকল যুগে। ভারতের বিভিন্ন দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চল থেকে সকল সময়েই লোকের যাতায়াত ছিল। বাংলা তাই ভারতের বিভিন্ন অংশের সংগে পরিচিত চিরকাল। আত্মীয়তাও ছিল না এমন নয়। কিন্তু ভাবভাবনা আদর্শ ইত্যাদির দিক থেকে নূতনের আস্বাদ তখন পায়নি কিছু। বাংলার তখন একমাত্র লাভ ছিল শোষণ। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের কথা বলছি। তারা শোষণ কোরেছে; কিন্তু বিনিময়ে বাংলাকে দেয়নি কিছু। ইংরেজ এল। এল চূড়ান্ত শোষণ স্পৃহা নিয়ে। কিন্তু দিয়েও গেল। দিল ইউরোপীয় সংস্কৃতি; দিল ইংরেজ সাহিত্যের আদর্শ; দিল নব ভাব-ভাবনা; দিয়েছিল বেকোনীয়ান্ যুক্তিবাদ। বাংলা দেশে এল নবজাগরণ।

সামাজিক পরিবর্তন এল খুব এবং দ্রুত। কিন্তু সেই সম্পর্কে বাংগালী দৃষ্টিহীন ছিল না। বাংলার সমাজ জীবনে ইংগ-বংগ সাংকর্য এসেছিল। ফলে বিকৃতি ঘটেনি যে তা বলা যায় না কিন্তু এই দেওয়া নেওয়ায় বাংলা বেসাতি করেছে প্রচুর। বৃহত্তর জাতি সচেতন ইংরেজের

সংস্পর্শে বাংগালী আত্মসচেতন হল; জাতীয়তা বোধ জাগল বাংলার মাটিতে; বাংগালী সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে চিন্তা করতে শিখেছিল। সেই কারণেই বাংগালীর চিন্তার বিষয় এবং বিস্তার প্রসারিত হয়েছিল। চিন্তার বিষয় এবং বিস্তার প্রসারিত হলে চিন্তা শক্তিও কাজেকাজেই বৃদ্ধি পাবে।

হয়েছেও তাই। বাংলার সমাজজীবনে এল যেমন ওলটপালট, তেমনি বাংলা নূতন নতন ভাব-ভাবনাতে ও উদ্বুদ্ধ হোয়ে উঠেছিল। নূতন ভাব-ভাবনা আদর্শের প্রসারের ফলে যে নব-দর্শনের আবিষ্কার তারই প্রকাশক্ষেত্র সাহিত্য। তাই বাংলালী সাহিত্যে অগ্রসর হোয়ে চলল। বিদ্যাসাগরের গদ্য রূপপরিগ্রহ করেছিল বঙ্কিমের কথাসাহিত্য উপন্যাস আর প্রবন্ধে। এল সেই সংগে সমাজসচেতনতার ফলে রসসাহিত্য—। 'আলালের ঘরের দুলাল', 'বাবু বিলাস' ইত্যাদি রসসাহিত্য তার নিদর্শন। সামাজিক বিকৃতির বিরুদ্ধে কশাঘাতের নিদর্শন এই সকল রসরচনা। চিন্তাশীল লোক যারা দৃষ্টিহীন ছিলেন না; এবং মাধ্যম নির্বাচন নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। কথার ভেতর দিয়ে কাহিনীর মাধ্যম সব কিছুই সহজ গ্রাহ্য। এল রসসাহিত্য।

কিন্তু এপর্যন্ত গদ্য সাহিত্যের রচনা রীতি বিদ্যাসাগরী ঢং-এই চলছিল। অবশ্য বঙ্কিম রচনারীতির মধ্যে যৎসামান্য পরিবর্তন যে আনেন নি তা নয়; তবে সেটা ছিল প্রধানতঃ প্রকাশ ব্যঞ্জনাতে শব্দ সংযোজনায়। অর্থাৎ সংস্কৃত প্রধান ভাষার সংগে চলতি কথার সংমিশ্রণ চেষ্টা দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র এক নূতন রচনা-রীতির সংকেত দিয়েছিলেন। এই সংকেতই হল চলতি বা বা কথ্য ভাষা-সমৃদ্ধ রচনার মুখবন্ধ। এই সংকেতই নূতন রচনারীতির প্রবর্তক।

স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব বঙ্কিমচন্দ্রের অব্যবহিত পরেই। বর্তমান বাংলা সাহিত্য-প্রগতির মূলে স্বামীজির দান কম নয়। তিনিই সর্বপ্রথম দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন-বক্তব্য সর্বজনবিদিত চলতি ভাষা বা লোককথার মাধ্যমে বিবৃত হওয়া দরকার। তাতে উক্ত বিষয় সাধারণের বোঝার পক্ষে সহজ হয় এবং বক্তার বক্তব্য বর্ণনায় আড়ষ্টতাও থাকবে কম। এতে আপত্তিও উঠেছিল। আপত্তিটা মামুলি সনাতনপন্থীর সনাতনপ্রীতির প্রতিক্রিয়া। আপত্তি ছিল-রচনা লঘু বা হালকা হোয়ে যাবে।

কিন্তু প্রশ্ন হল লঘু হবে রচনা ভংগী? না, রচিত বিষয়! বিষয় ভাষার জন্য লঘু হবে একথাটার ভিত্তি আছে বোলে মনে হয় না। বিষয়ের গুরুত্ব বর্ণনার জন্য খর্ব হবে এমন যুক্তি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সমস্ত নির্ভর করবে বিষয়বস্তুর নিজস্ব গুরুত্বের উপরে। বরং চলতি ভাষায় গুরু বিষয় ব্যক্ত হলে বিষয়বস্তু সহজবোধ্য এবং সাবলীল হবে নিশ্চয়। অবশ্য ব্যঞ্জনা এবং রচনা ভংগীর উপরে নির্ভর করবে বিষয়বস্তুর সুবোধ্যতা। ভাষা যা-ই-হউক বিষয় এবং বিষয়ের বিস্তার নির্ভর করবে প্রকাশ ও রচনাশৈলীর উপরে। অথচ চলতি ভাষা ব্যবহারের সুবিধা থাকলে সাধারণের পক্ষে বিষয় ও বিষয়ের তাৎপর্য সহজবোধ্য হবে এবং বক্তব্যও হবে সহজ সরল। এতদতিরিক্ত ভাষার সংগে সাধারণের পরিচয় সৌকর্য গুণে ভাষা সুখপাঠ্যও হবে খুব।

স্বামীজির এই ইংগিত গ্রহণের ইচ্ছা থাকলেও প্রথম প্রথম সাহসের অভাব ঘটছিল। বোধ করি নূতন পথ ও পন্থা অবলম্বনের মত জ্ঞান ও শক্তির সঞ্চয় ছিল অপ্রতুল কিন্তু তবু স্বামীজির নির্দেশনা মঙ্গলকর বোলে সকল চিন্তাশীল লোকই স্বীকার করেছিলেন; নইলে বিংশ শতাব্দীর সুরু থেকেই রচনাতে চলতি ভাষা ব্যবহারের প্রচেষ্টা ক্রমবর্ধমান হোয়ে উঠেছে এই সত্য সন্দেহাতীত ভাবে লক্ষণীয়। ফলে গুরুচণ্ডালী ভাষায় সংজ্ঞা ধারণা ইত্যাদি বদলে যেতে লাগল। আজ গুরুচণ্ডাল বলতে সংস্কৃতজ শব্দ এবং চলতি শব্দ পাশাপাশি বসানো

আর বুঝি না; আর চলতি ভাষাকে অবজ্ঞার চোখেও দেখিনে। অর্থবিন্যাস যদি স্পষ্ট হয় অথচ শব্দ সংকলন যদি শ্রুতিমধুর হয় এবং রচনা ভংগীতে যদি রসপ্রবাহ থাকে, তবে কেবল শব্দ ব্যবহার ও চয়ন নিয়ে ব্যস্ত হইনে।

অথচ এই শব্দ সংমিশ্রণ এক সময়ে অপরাধ বোলে গণ্য হত। তারই প্রতিক্রিয়ায় জন্ম হয়েছিল 'শব পোড়া মড়া দাহের' বক্র উক্তি, হালকা রসিকতা। যতই বক্র উক্তি করা হোক না কেন, আসলে কিন্তু বাংলার রস-সাহিত্যে Satire grotesque ইত্যাদির বিকাশের মূল খুঁজতে গেলে এইখানেই এসে পৌঁছতে হবে। এই ঠাট্টা তামাসার মাধ্যমে আবির্ভাব টেঁকচাঁদের। এবং এই তামাসা কণ্ডুয়নের মৈনাক মন্থনের উৎসৃত রস আমরা উপভোগ করছি রসরাজের থেকে সুরু কোরে রবীন মৈত্র ও পরশুরাম বা রাজশেখর পর্যন্ত। মৈত্র এবং পরশুরামের রসরচনা যে কোন পাশ্চাত্য রসরচনার পাশে সসম্মানে আসন পেতে পারে। রবীন মৈত্র ও পরশুরাম টাইপ রচয়িতা। এদের রচনার মধ্যে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব যেমন, তেমনই তা রসসঞ্চার এবং রচনাশৈলীর সর্বগুণে গুণান্বিত। এই শ্রেণীর রচনাকে বক্র উক্তি ব্যঙ্গপ্রকাশ হাস্যকৌতুক এবং রস বিতরণের মর্য্যাদা দিলেই যথেষ্ট সম্মান গৌরব দান করা হয় না। আবরণ হালকা হলেও বিষয়ের বিস্তার সুদূর প্রসারী। এই ধরণের রচনা সাহিত্যের প্রগতি এবং সামাজিক পুনর্বিকাশের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় তো রস চরনার মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের দায়িত্বই গ্রহণ করেছিলেন, এবং সমাজদেহের ব্যাধিনিরাময়ে তিনি সিদ্ধপুরুষ নিঃসন্দে। কিন্তু রবীন মৈত্র ও পরশুরাম গোষ্ঠীর লেখকদের প্রতিভা বহুমুখী, এবং সমাজ-সাহিত্য ভাষা ভাববিন্যাস ইত্যাদি সর্ববিধ বিষয়ে এঁদের কৃতিত্ব প্রমাণিত হয়েছে।

কথা-প্রবন্ধ-ইতিহাস ইত্যাদি সাহিত্য আজ স্বামীজি নির্দেশিত পথে দ্রুত অগ্রসর হোয়ে এসেছে। ফলে আজকের রচনা ভাষা সমৃদ্ধিতেই কেবল সমৃদ্ধ নয়; আধুনিক রচনা তাই সহজবোধ্য সুখপাঠ্য এবং এক কথায় বলতে গেলে সাধারণ-গ্রাহ্য হোয়ে উঠেছে।

কাব্য প্রগতি পথেও ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকালে ঈশ্বরচন্দ্রের সমসময়িক সময়ে যুগাবর্ত এসেছিল। প্রাচীন কাব্য পদ্ধতি বদলে গেলে এবং ভাব কল্পনার দিক থেকেও এক নূতন কলেবর গ্রহণ করেছিল। কাব্যের যুগকর্তা মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ছন্দে ব্যঞ্জনায় পরিপ্রেক্ষিতে এবং কল্পনায় সকল দিক থেকেই সম্পূর্ণ পরিবর্তন এনেছিলেন। অমিত্রাক্ষর সনেট ইত্যাদি ছন্দ পাশ্চাত্যের কাব্যভাণ্ডার থেকে সঞ্চিত। সঞ্চিত হলেও এই সকল ছন্দ নিজস্বতা অর্জন করেছে যথেষ্ট। অতঃপর রবীন্দ্র যুগ রবীন্দ্রোত্তর যুগে ছন্দের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে প্রচুর। রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কয়েকজন তো বাংলা কাব্য জগতে বিবর্তন এনেছেন এত যে আধুনিক বাংলা সমৃদ্ধিতে বিশ্বদরবারে বিশেষ স্থান দখল করতে পেরেছে।

আধুনিক কাব্য নামকরণ হয়েছে এক নবতর মাধ্যমে অভিব্যঞ্জনার বিকাশকে আধুনিক নামকরণের অবশ্য তাৎপর্য তেমন কিছু নেই। যে কোন কাব্যই সমকালীন যুগে আধুনিক এবং যুগধর্মী। তথাপি আধুনিক কথাটার একটা তাত্ত্বিক এবং বর্ণনাত্মক বিশেষ সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছে। এই নতুন সংজ্ঞার মৌলিক গুণাগুণ নির্ধারণ করার সময় এখনও এসেছে বোলে মনে করিনে। তথাপি এই নূতন কাব্যধারাকে একেবারে অস্বীকার কোরে চলতে পারছিনে।

বস্তুবাদ আধুনিক কাব্যের প্রধান উপজীব্য বোলে দাবী করা হয়। কিন্তু বস্তুকে সম্পূর্ণ বাদ কোন কাব্যই দিতে পেরেছে কি কোনকালে? তবু সে বস্তুবাদ দুর্বোধ্য হলে কাব্য রসসিঞ্চিত হল কিনা সন্দেহ। তা ছাড়া বস্তুবাদী তত্ত্ব প্রকাশের জন্য যদি দূরারোহ কল্পনা বা তথ্যের অবতারণা করা হয়, যদি বর্ণন ভংগীর মধ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর মধ্যে অন্তরা থাকে বিপুল তবে

সে কাব্য রসোত্তীর্ণ হতে পারবে কতটুকু তা অবশ্যই বিবেচনার বিষয়। কাব্যের আরোহণ কতটা সুগম সেটাও বিচার্য নিঃসন্দেহ। তথাপি প্রগতিশীল সাহিত্যের সজীবতার পরিচায়ক যে এই আধুনিক কাব্য তা অস্বীকার করা যায় না। এতেও পাশ্চাত্যের প্রভাব অতিমাত্রায় বিদ্যমান আছে—একথাও স্বীকার করতে হবে। তবে আধুনিক বস্তুবাদী কাব্যের যুক্তি রচনা রীতি এবং কাব্যমূল্য যে ভাবেই নিরূপিত হোক না কেন, কাব্য আরও সুখপাঠ্য হওয়া দরকার, এবং লক্ষ্য রাখতে হবে সাধারণের আবৃত্তিযোগ্য যেন হয়। নইলে কবিতার সে সুললিত সুর লোকের স্মৃতি-শক্তিকে জাগরূক রাখে তার অভাব ঘটবে, এবং ফল হবে কবিতা পাঠ ও বিস্মরণ প্রায় সহসংগী; কাজেই বিজ্ঞতা যতই প্রকাশিত হোক জনপ্রিয়তা বা লোকপ্রিয়তা অর্জন করতে সমর্থ হবে না।

তারপর আসে নাট্য সাহিত্য। আধুনিক নাট্য সাহিত্যের গুরু গিরীশচন্দ্র। নাট্য সাহিত্যের আবির্ভাব ও উনবিংশ শতকের শেষ বিংশতি অংশে। নাট্য জগতে এল আমূল পরিবর্তন। গিরীশচন্দ্রের নাট্যধারা সমাজরীতি নিয়ে, এর আংগিক গঠিত হল পাশ্চাত্য ধারায়, বিশেষ কোরে সেক্ষপীয়রীয় রীতিতে। এটা হল ইংরেজের সংগে সংস্পর্শের ফল। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে বিষয় বস্তুর বাছাই প্রশংসনীয়। আবার প্রথম পরিচয়ের প্রতিক্রিয়া রূপে বাংগালী সমাজের উপরে ইংরেজদের প্রভাব বিকৃতি যে বিষক্রিয়া করেছিল তা প্রতিরোধ করতে রামমোহন পারেনি নি প্রখর যুক্তিবাদী ডি রোজিওর শিক্ষা পারেনি রসিকলাল মল্লিক সমর্থ হননি। ফলে অদ্ভুত এক অভিযাত্রী সমাজ গোড়ে উঠেছিল। সে সমাজ না পশ্চিমী না ভারতীয় না ইসলামী; তার আদর্শ বিশ্বাস হিন্দু-ইসলাম-খৃষ্ট কোনটাকেই মেনে চলত না। অথচ সবটারই ছিল একটা রসাল মিক্‌চার। এই শঙ্কর সমাজ ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে ক্রমে ভেংগে পড়ছিল, কোন আগ্রহই সে সমাজকে বেঁধে রাখতে পারছিল না। এরই নাট্যরূপ প্রফুল্ল ইত্যাদি। গিরীশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলোকেও সেক্ষপীয়রীয় রীতি অবলম্বন রচিত।

অতঃপর বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। রচনারীতিতে নূতন পথ গ্রহণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কাব্যিক রসব্যঞ্জনার অভাবে দীর্ঘ কথা ও স্বগতোক্তি অত্যন্ত ভারাক্রান্ত কোরে তুলেছে বোলে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রবর্তিত নাট্যরীতি দীর্ঘায়ু লাভ করতে পারেনি। নূতন ধারার আবির্ভাব সত্বেও গিরীশী রীতিই প্রাধান্য নিয়ে বেঁচে রইল।

তারপর ইদানিং যুগে কথা ও আলপনা প্রধান নাট্য রীতি যথার্থপক্ষে নূতন যুগের প্রবর্তন করেছে। কাটা কাটা কথোপকথনের গুণে নাটকের গতি বেড়েছে এবং দীর্ঘায়তন উক্তির শৃঙ্খলা থেকে মুক্ত হয়েছে। নাট্যোক্ত কথোপকথনের ভাষাতে সাধারণ চলতি ভাষার প্রবর্তন হেতু শ্রুতি মধুর এবং একঘেয়েমিমুক্ত হতে পেরেছে। গতি এবং শ্রুতিমধুরতা হেতু চরিত্রালেখ্য মানুষের মনকে সহজেই আকর্ষণ করে এবং চরিত্রগুলি একান্ত পরিচিত সামাজিক লোক বোলেই মমতা লাভ করতে পারে। এই নব্য নাট্যধারা তাই যথার্থ প্রগতির সূচনা।

কিন্তু লোক নাট্য তার প্রতিষ্ঠা হারিয়ে ফেলেছে। উপরোক্ত নাট্য সাহিত্য লোক নাট্যের বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। তাই বোধ করি আলাদা কোরে লোকনাট্যের সমাদর আর অনুভূত হয় না। লোক নাট্য বলতে 'যাত্রা, কৃষ্ণলীলা, পালাগান ইত্যাদি বুঝাতে চাই।

একটা কথা অবশ্য উল্লেখ না করলে এই প্রবন্ধের অংগ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেটা হল শব্দ চয়ন ও শব্দ সম্পদ বৃদ্ধি। প্রাক্ ইংরেজ প্রাধান্য যুগে কিছু কিছু আরবী-ফরাসী শব্দ তৎকালীন কাব্যাদিতে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু একথা অবিসম্বাদিত সত্য যে কথিত বা চলতি বাংলাতে আরবী-ফরাসী ইত্যাদি বৈদেশিক শব্দ অধিকতর সংখ্যায় চলতি হয়েছিল। কথ্য ভাষায় রচনা রীতি প্রচলিত হওয়াতে এই সকল শব্দ স্বতঃই সাহিত্যের আসরে স্থান লাভ করেছে।

এতব্যতীত পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজী প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষার যে সকল শব্দ বাংলা ভাষায় ঢুকে গিয়েছিল তাদের প্রবেশাধিকার ঘটেছে কথ্য ভাষার দ্বারপথে। তারাও ক্রমে বাংলা গোত্রীয়-রূপে আসন লাভ করেছে। সংস্কৃতজ শব্দ তো বাংলার একেবারে গুরুস্থানেই আসন লাভ করেছে।

ঊনবিংশ শতক পর্যন্তও বৈদেশিক শব্দ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে সাহিত্য চক্রবর্তীদের কিছু কিছু উন্নাসিকতা দেখতে পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন চলতি ভাষার মাধ্যমে অনাড়ম্বর ভাবে কিছু কিছু বৈদেশিক শব্দ সাহিত্যের অন্দর মহল পর্যন্ত পৌঁছেছিল। ঊনবিংশ শতকে সেই সকল শব্দকে বরং নির্বাসিত করার চেষ্টা চলেছে। তখন সংস্কৃত ও সংস্কৃতজ শব্দকে বিশেষ কৌলিন্যের আসনে বসাবার চেষ্টা হয়েছিল বোলে মনে হয়। তার একটা কারণও ছিল। কারণ হল চলতি হলেও ঐ সকল বিদেশী শব্দ আভিধানিক সম্ভ্রম লাভ করতে পারেনি। ফলে বাংলা ভাষায় তাদের উপনয়নই হয়নি; তাই সামাজিক সম্ভ্রম থেকে বঞ্চিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিকরা স্বামীজির কাছে থেকে প্রেরণা লাভ কোরে চলতি ভাষার দিকে ক্রমেই যখন বেশিবেশি ঝুঁকে পড়তে লাগলেন তখন ঘোষণা ছাড়াই তারা সাহিত্যের পদমর্যাদার উন্নিত হল। ফলে তাদের অভিধানেও জায়গা লাভ হোয়ে গেল। এই আভিধানিক মর্যাদা দানের প্রথম দায়িত্ব বোধ করি জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য পরবর্তী যুগে রাজশেখরের চলন্তিকা বৈদিশিক শব্দ সঞ্চয়কে অধিকতর জনপ্রিয় কোরে তুলেছে। সত্যেন্দ্রনাথ তো আরবীফরাসী শব্দ মাতৃভাষার মত ব্যহার কোরে গিয়েছেন।

বৈদেশিক শব্দ বিশেষ কোরে আরবী-ফরাসী শব্দ অধিকতর চলতি ছিল পূর্ব বংগীয় ভাষাতে। পূর্বে পূর্ব-বংগীয় ভাষাকে বংগজ ভাষা বোলে পারিয়া কোরে রাখা হয়েছিল। চলতি ভাষার প্রচলনও পূর্ব-বংগীয় শব্দ সাহিত্যের দরবারে প্রবেশাধিকার লাভ প্রথমে করেনি। ইদানীং-কালে কথাসাহিত্যের মাধ্যমে পূর্ব-বংগীয় আলাপনকে সাহিত্যের মর্যাদা দান করা হয়েছে। এতে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে পথপ্রদর্শক।

শব্দ সম্ভার বৃদ্ধির পক্ষে বীরবলী (প্রমথনাথ চৌধুরী) রচনা পদ্ধতি হয়তো আরও ফলপ্রসূ হতে পারত। কিন্তু বীরবলী রীতি বহুজন গৃহীত হয়নি। হলে বাংলা সাহিত্যের উপকার হত বোলে আমাদের বিশ্বাস। অবশ্য প্রয়োজনমত সংস্কারের হয় তো আবশ্যক তাতে ছিল এবং থাকবে সদাই।

সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সূচী

মানসী ও মর্ম্মবাণী

অষ্টম বর্ষ

বৈশাখ ১৩২৩

অপমানিত

'তোমারে কি বারবার করেছিনু অপমান', বলাকা

নবম বর্ষ

মাঘ ১৩২৪

ভিক্ষা

'আমি যখন তাঁর দুয়ারে ভিক্ষা নিতে যাই' ॥ গান

দশম বর্ষ

চৈত্র ১৩২৪

গান

'কাম্নাহাসির দোল-দোলানো'

জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫

ফাঁকি

পলাতকা

একাদশ বর্ষ

আশ্বিন ১৩২৬

পুরানো বাড়ি

লিপিকা

কার্তিক ১৩২৬

সন্ধ্যা ও প্রভাত

লিপিকা

মাঘ ১৩২৬

[পত্র]

মেঘনাদবধ প্রসঙ্গে আলোচনায় শ্রীসুবোধ সান্যাল কর্তৃক উদ্ধৃত

অপ্রকাশিত

ত্রয়োদশ বর্ষ

বৈশাখ ১৩২৮

[পত্র]

'তুমি যে কাজে আমাকে.....।' ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭
ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিত ও তাঁহার 'ভারতের জাতীয় মহাশঙ্খ'
প্রবন্ধে মুদ্রিত।
অপ্রকাশিত

চ তু র্দ শ ব র্ষ

শ্রা ব ণ ১ ৩ ২ ১

[পত্র]
'আমার পিতাঠাকুর আপনাকে তাঁদের...।' ৩ শ্রাবণ ১৩০৬
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত। মন্মথনাথ ঘোষ-লিখিত
'হেমচন্দ্র' চরিতাখ্যানে মুদ্রিত।
অপ্রকাশিত ১

স প্ত দ শ ব র্ষ

মা ঘ ১ ৩ ৩ ২

জগদিন্দ্র-বিয়োগে
নাটোরের মহারাজ রবীন্দ্রনাথের প্রিয়সুহৃৎ জগদিন্দ্রনাথ রায়ের পরলোকগমন
উপলক্ষ্যে লিখিত
অপ্রকাশিত ২

অ ষ্টা দ শ ব র্ষ

শ্রা ব ণ ১ ৩ ৩ ৩

পত্র
'তোমাদের যে মিলন হবে'
মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের পুত্র যোগীন্দ্রনাথের বিবাহোপলক্ষ্যে প্রেরিত কবিতা।

উ ন বিং শ ব র্ষ

ফা ল্গু ন ১ ৩ ৩ ৩

গান
'পুরানো জানিয়া চেয়ো না আমারে' ঃ গান। ৯ ফাল্গুন ১৩৩৩, শান্তিনিকেতন

বিং শ ব র্ষ

ফা ল্গু ন ১ ৩ ৩ ৪

গান ॥ 'খরবায়ু বয় বেগে'। পিনাঙ ১৮ অক্টোবর ১৯২৭

এ ক বিং শ ব র্ষ

ফা ল্গু ন ১ ৩ ৩ ৫

পুরাতন
"পুরাতন", মহুয়া

কা র্তি ক ১ ৩ ৩ ৬

স্মৃতি
গান ॥ 'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে।'
ইন্টারন্যাশনাল রেলওয়ে, সিয়াম, ১৭ অক্টোবর ১৯২৭
১৭ অক্টোবর ১৯২৭

ভ্রমসংশোধন ॥ মাঘ ১৩৬৭ ॥ যোগ হইবে

মা ন সী ॥ ষষ্ঠ বর্ষ

বৈ শা খ ১ ৩ ২ ১

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা
পাবনায় উত্তরবঙ্গ সম্মিলনে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির
জন্য যে অভিনন্দন করা হয় তাহার উত্তরে
অপ্রকাশিত

পুলিনবিহারী সেন
পার্থ বসু

১॥ কবিবর হেমচন্দ্রর প্রায়ান্ধদশা ঘটিলে যাঁহারা তাঁহার আনুকল্যবিধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্যতম অগ্রণী ছিলেন। এই প্রসঙ্গে হারাণচন্দ্র রক্ষিত কর্তৃক দুর্গাদাস লাহিড়ীকে লিখিত পত্র মন্মথনাথ ঘোষ প্রণীত "হেমচন্দ্র" গ্রন্থ (তৃতীয় খণ্ড, পৃ ২৪৪) হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

·· "একটা আনন্দ সংবাদ দিই,—এইমাত্র রবি বাবুর এক পত্র পাইলাম যে, স্বাধীন ত্রিপুরার সেই মাননীয় মহারাজ, হেমচন্দ্রের দুঃখে দুঃখিত হইয়া হেমচন্দ্রকে তাঁহার জীবিতকাল পর্যন্ত

ত্রিশ টাকা হারে মাসিক বৃত্তি ও নগদ দুই শত টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন। ভাই! এত চেষ্টা যত্ন ও পরিশ্রম বুঝি এইবার সার্থক হইল। আপনি বুঝিতে পারিতেছেন, কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই ইহার মূলাধার। তাঁহার এই প্রকৃত কবিজনোচিত ব্যবহার স্মরণ করিয়া আমার চক্ষে জল আসিতেছে। সত্য বলিতে কি, হেমবাবুর এই উপকার আমি যেন আত্ম উপকারের ন্যায় অনুভব করিতেছি।"

রবীন্দ্রনাথ অপরাপর আত্মীয়বন্ধুদের নিকট হইতেও অর্থসাহায্য সংগ্রহে ব্রতী হইয়াছিলেন, মন্মথনাথ ঘোষ তাঁহার পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে ইহার তালিকা দিয়াছেন। মানসীতে প্রকাশিত হেমচন্দ্রকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের ৩ শ্রাবণ ১৩০৬ তারিখের পত্র এবং সাহায্যলাভ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত হেমচন্দ্রর একখানি পত্র (বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩৪৭, পৃ ২৯) নিম্নে পুনর্মুদ্রিত হইল।

ওঁ

৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন
যোড়াসাঁকো
কলিকাতা

বহুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন —

আমার পিতাঠাকুর আপনাকে তাঁহার আন্তরিক আশীর্বাদ জানাইতে বলিয়াছেন এবং প্রতিমাসে আপনার সাহায্যার্থে ২০৲ কুড়ি টাকা নিয়মিত পাঠাইবার জন্য আমাকে আদেশ করিয়াছেন। প্রতিমাসের ২০শে তারিখে এখান হইতে টাকা প্রেরিত হইবে। গত মাসের টাকা অগ্রসহ পাঠাই অনুগ্রহ পূর্বক গ্রহণ করিবেন। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মাসে মাসে ১০৲ টাকা করিয়া দিবেন সেও এই সঙ্গে পাইবেন।

আপনার পুত্র আপনার গ্রন্থাবলী হইতে সংকলন করিয়া যে বাল্যপাঠ্য গ্রন্থ ছাপাইয়াছেন, আমার নিকট তাহার এক খণ্ড প্রেরণ করিলে বিদ্যালয়ে তাহা প্রচার করিবার জন্য বিশেষ সচেষ্ট হইব। কৃতকার্য হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

আমরা যে সামান্য দান পাঠাইলাম, আমার পিতৃদেবের আশীর্বাদ স্বরূপ তাহা অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করিলে আনন্দ লাভ করিব। ইতি ৩রা শ্রাবণ ১৩০৬।

অনুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বেনারস সিটি

যথোচিত সম্মানপূর্বক নিবেদন

জগদীশ বাবুর সহিত যে বিষয়ে কথা হইয়াছে তাহাতে কৃতকার্য্য হইবার আশা থাকিলে বিশেষ সাহায্য হইবার কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি তো সম্প্রতি জড়পিণ্ড মাত্র। না আছে শক্তি না আছে দৃষ্টি। গ্রন্থাবলী হইতে নিজে কবিতা উদ্ধৃত করিয়া শিশুপাঠ্য একখানি পুস্তক করি সে ক্ষমতাটুকু আমার আর কই? তাহার উপর মুদ্রিত করান আছে। ইহার পরে ডিরেক্টার আপিসে বা টেক্‌স্‌ট্‌ বুক কমিটিতে যদি কিছুকাল সাধ্যসাধনা করিবার প্রয়োজন হয় সে অবস্থা তো আর আমার নাই। কবিতাবলী হইতে কয়েকটি কবিতা লইয়া নূতন সংস্করণ কবিতাবলী নামে পুরেরা

একটী সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। সেখানি টেক্‌স্‌ট্‌ বুক কমিটি নাকি অনুমোদন পর্য্যন্ত করিয়াছেন এই। অনুমোদন করাইতে তাহাদিগকে এক বৎসর দেড় বৎসর ধরিয়া অনবরত চেষ্টা করিতে হইয়াছে। তথাপি আজ পর্য্যন্ত কোন্ শালে কোন পরীক্ষায় পাঠ্য নির্দ্ধারিত হইবে তাহার কিছুই জানা যায় নাই। যদি কোনও পরীক্ষায় পাঠ্য না হয় তবে বৃথা। অবস্থা আপনাকে জ্ঞাত করিলাম। আপনি পরম বিচক্ষণ। প্রস্তাবিত বিষয়ে সুফল হইবে এরূপ যদি স্থির আশা করিতে পারেন তবে যাহা সদ্‌যুক্তি হয় পরামর্শ দানে বাধিত করিবেন। ইতি

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

Benares City
C/o. Dr. Purnachandra Banerjee,
29/7/99.

সবিনয়নিবেদনমিদম

গতকল্য জমিদার শ্রীযুক্তবাবু প্রমথ নাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রেরিত শ্রাবণ মাসের দরুণ ১০৲ দশ টাকা পাইলাম। বুঝিলাম ইহাও আপনার দ্বারাই হইয়াছে। এই টাকাটীও কি আপনি পাঠাইবেন না প্রমথ বাবুর বাড়ীর ঠিকানায় লিখিতে হইবে এবং মাসের কোন তারিখের মধ্যে লিখিতে হইবে অনুগ্রহ করিয়া ও বিষয়ে উপদেশ দিবেন।

আমার প্রতি আপনি যে উপকার করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহার জন্য ভাষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার আমার ক্ষমতা নাই। ইতি

আপনারই
শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পুনঃ এই পত্রের সহিত প্রমথবাবুকেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া এক পত্র লিখিলাম।

হেমচন্দ্র-রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে, ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত হেমচন্দ্রের কথোপকথন মন্মথনাথ ঘোষের হেমচন্দ্র গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল। ইহা হেমচন্দ্রের পীড়ার কয়েক বৎসর পূর্বের কথা।

"সে বোধ হয় ১২৯৬ সালের কথা। সকল কথাবার্তা মনে নাই। যাহা মনে আছে তাহা নিম্নে লিখিলাম।.....

আমি। রবি বাবুর কবিতা আপনি পড়েন?

হেমবাবু। পড়ি; কিন্তু দেখ ভাল বুঝিতে পারিনে বাপু!

(পরে রবি বাবুর নিকট এই কথা আমি গল্প করিয়াছিলাম। শুনিয়া তিনি হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিলেন।) .....

২॥ নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় রবীন্দ্রনাথের প্রিয় সুহৃদ ও বহু ক্ষেত্রে সহযোগী ছিলেন, "পঞ্চভূত" গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে উৎসর্গ করেন। জগদিন্দ্রনাথ 'পঞ্চভূত'-এর অন্যতম ছিলেন, এরূপ কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন। জগদিন্দ্র-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে স্মৃতিকথা লিখিয়াছিলেন তাহা এখনও গ্রন্থভুক্ত হয় নাই, চৈত্র সংখ্যায় "রবীন্দ্র-রচনা-সংকলন" বিভাগে তাহা উদ্ধৃত হইবে।

জাল প্রতাপের মামলায় দ্বারকানাথ

অমৃতময় মুখোপাধ্যায়

সেকালের একটা মকদ্দমায় দ্বারকানাথ বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন—তবে আইনজ্ঞ হিসাবে নয়, সাক্ষী হিসাবে। মামলাটা হল তথাকথিত জাল প্রতাপচাঁদের। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের দাদা সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্গ দর্শনে লিখেছেন যে "লেখক নিজে সে সময়ে হুগলীতে উপস্থিত ছিলেন, তখন তাঁহার বয়স অল্প, কিন্তু এই মকর্দমা লইয়া ঘরে ঘরে যেরূপ হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা তাঁহার স্মরণে আছে। ঐ অঞ্চলের স্ত্রীলোকমাত্রেই প্রতাপচাঁদের পক্ষপাতিনী হইয়াছিল। "তাহারা গঙ্গার ঘাটে গিয়া, আপনার কথা ভুলিয়া, শিবপূজা ভুলিয়া কেবল প্রতাপচাঁদের কথা কহিত। ভিক্ষুকেরা কৃষ্ণগীত ছাড়িয়া কেবল প্রতাপচাঁদের গীত গাহিত, প্রতাপচাঁদের "জয় হউক" বলিয়া তাহারা ভিক্ষা চাহিত। ভিক্ষুকের গীত বালকরা শিখিয়া পথে ঘাটে দল বাঁধিয়া নাচিয়া নাচিয়া গাহিত—"পরাণবাবু হয়ে কাবু, হাবুডুবু খেতেছে" এ গীত যখন তখন যেখানে সেখানে শুনা যাইত।"

প্রতাপচাঁদ বর্ধমানের মহারাজা তেজচাঁদ বাহাদুরের ছেলে। মহারাজ তেজচাঁদ বাহাদুর শত্রুর মুখে ছাই দিয়া এক একটী করিয়া ক্রমে ক্রমে সাতটী বিবাহ করেন। মধ্যবয়সে তিনি একদিন দরিদ্র একটী বালিকাকে পথে খেলিতে দেখিলেন। বালিকা পরমসুন্দরী। মহারাজ তৎক্ষণাৎ তাহার পিতার সন্ধানে লোক পাঠাইলেন। লোক আসিয়া বলিল "পিতার নাম কাশীনাথ, জগন্নাথ দর্শনে যাইবে বলিয়া সপরিবারে লাহোর হইতে এখানে আসিয়াছে। জাতিতে ক্ষত্রিয়।" মহারাজের আর বিলম্ব সহিল না, দরিদ্রকে অর্থলোভ দেখাইয়া কন্যাটীকে বিবাহ করিলেন। তিনিই মহারাণী কমলকুমারী।

সেই অবধি দরিদ্র কাশীনাথের অবস্থা ফিরিল, পুত্র লইয়া তিনি বর্ধমানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পুত্রটী বালক, তাহার নাম পরাণ—তিনিই আমাদের এই গল্পের পরাণবাবু।

বিমাতা কমলকুমারী প্রতাপচাঁদের উপর বড় সদয় ছিলেন না। "বিমাতা সর্বত্র কুমাতা বিশেষ রাজবাটীতে। একা বিমাতা নহে, বিমাতার সহোদর পরাণবাবু প্রতাপচাঁদকে একেবারে দেখিতে পারিতেন না। প্রতাপ তাহা জানিতেন এবং তাহার প্রতিশোধ মধ্যে মধ্যে লইতেন। জনশ্রুতি আছে যে, একদিন প্রতাপচাঁদ পরাণবাবুর পশ্চাদ্দেশে কলিকা পুড়াইয়া ছাপ দিয়াছিলেন।"

বিস্তৃত সম্পত্তির উপর পরাণবাবুর একাধিপত্যের একমাত্র অন্তরায় হইল প্রতাপচাঁদ। বুড়া রাজাকে বশ করা হয়ত শক্ত হইত না কিন্তু প্রতাপচাঁদকে বশে আনা বা সরাইবার উপায় কোনই পাওয়া গেল না।

প্রতাপচাঁদ অল্পবয়সেই বিষয়কার্য্য দেখিতে আরম্ভ করেন। লোকে বলে পরাণবাবু তাহাতে প্রতিবাদী হইয়াছিলেন। কেন হইয়াছিলেন তাহা বুঝা শক্ত নয়। প্রতাপচাঁদ সেইজন্য "কৌশলে পিতার নিকট হইতে সমুদয় বিষয় দানপত্র লিখাইয়া লইয়াছিলেন।"

পরাণবাবু ইহার প্রতিবিধান করিবার জন্য ব্যস্ত থাকিলেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না। তাঁহার এক পরমাসুন্দরী কন্যা অবিবাহিতা ছিল। তিনি অনেক ভাঁবিয়া চিন্তিয়া সেই কন্যা বৃদ্ধ রাজা তেজচাঁদকে সম্প্রদান করিলেন। লোকে অবাক্ হইল। মহারাজ তেজচাঁদ

বাহাদুর পরাণবাবুর ভগিনীপতি ছিলেন, এবার আবার জামাতা হইলেন। এই শেষ বিবাহটী তেজচাঁদ অতি বৃদ্ধ বয়সে করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার পুত্র প্রতাপচাঁদ যুবাপুরুষ, বিষয়কার্য তিনিই দেখেন, বৃদ্ধ রাজা অপটু বলিয়া সে সকল কার্য্য হইতে নিরস্ত হইয়াছিলেন।

আটাণ বৎসর বয়সে প্রতাপচাঁদ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে গঙ্গাযাত্রা করিয়ে অম্বিকা কালনায় নিয়ে যাওয়া হয়। "তাহার সঙ্গে বৃদ্ধ মহারাজ স্বয়ং গেলেন। প্রতাপচাঁদের দুই স্ত্রী ছিলেন তাহারা কেহই যান নাই। কালনায় ক্রমেই তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পাইল। একদিন রাত্রি দেড় প্রহরের সময় তাঁহাকে পাল্কী করিয়া গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া হইল এবং কানাত দ্বারা ঘাই ঘেরিয়া তাঁহাকে অন্তর্জলি করা হইল। রাত্রি বড় অন্ধকার, আট দশটা মাত্র মশাল সেখানে জ্বলিতেছিল, তাহাতে আলো ভালো হয় নাই। জলের ধারে একটা তাঁবু খাটানো হইয়াছিল; পৌষ মাস, বড় শীত, আত্মীয় স্বজনেরা তথায় বসিয়াছিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের পর শবদাহ হয়, রাত্রি তিন প্রহরের সময় রাজা তেজ চাঁদ বাহাদুর বর্দ্ধমান যাত্রা করেন।

প্রতাপচাঁদের মৃত্যুর পর জমিদারী লইয়া তেজচাঁদ বাহাদুরের সহিত প্রতাপচাঁদের দুই রাণীর মোকদ্দমা লাগিয়া গেল। প্রতাপচাঁদ দানসূত্রে বিষয় পাইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার রাণীরা বিষয়াধিকারিণী; এবং সেইজন্য তাঁহারা দাবী করিলেন; এবং তদনুসারে জজ আদালতে তাঁরা ডিক্রীও পাইয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিষয়ে অধিকার লন নাই, মাসহারা অঙ্গীকারে নিরস্ত হন।

কিছুদিন গেলে, পোষ্যপুত্রের কথা উঠিল। অনেক তর্কবিতর্কের পর তেজচাঁদ সম্মত হইলেন। পরাণবাবুর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র গৃহীত হইল। তাহার নাম কুঞ্জবিহারী কি নারায়ন বিহারী একটা কি ছিল—রাজপুত্র হইলে সে নাম বদলিয়া রহাতাপ চাঁদ রাখা হইল।

প্রতাপচাঁদের মৃত্যুর পর এই রটনা হয়েছিল যে, তিনি কোন পাপিষ্ঠার কৌশলে পড়িয়া মহা-পাপগ্রস্থ হইয়াছিলেন। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য চতুর্দশবৎসর অজ্ঞাতবাস গিয়াছেন—মরেন নাই। প্রকাশ্যে গৃহত্যাগ করিলে যদি অজ্ঞাতবাস সিদ্ধ না হয়, তাই তিনি কালনার ঘাটে শব সাজিয়াছিলেন। এ রটনা সহজেই লোকে বিশ্বাস করিল। বিশ্বাসের তাৎপর্যও ছিল। একে যুবা, তাহাতে আবার রাজপুত্র, ঐশ্বর্যাদি সকল ছাড়িয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে চলিলেন। এরূপ যাওয়াই বীরত্ব। সকলে এ রটনা বিশ্বাস করিল, প্রতাপচাঁদের উপর লোকের ভালবাসা বাড়িল, সকলেই ঘরে বসিয়া তাঁহার মঙ্গলকামনা করিতে লাগিল। "আহা! ভালয় ভালয় আবার ফিরিয়া আসুন" এ কামনা স্ত্রীলোক মাত্রেই করিল।

"পঞ্চদশ বর্ষ পরে, ১৮৩৫ সালে একজন সন্ন্যাসী বর্ধমানে প্রবেশ করিল।" সে রাজবাটীতে চারিদিক দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল, কেহ কোন বাধা দিল না। "শেষে বারম্বারীতে উপস্থিত হইল। বারম্বারী বহুকাল মেরামত হয় নাই, তাহার দুই একটী দ্বার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, দুই একস্থানে চুনকাম খসিয়া গিয়াছে, সন্ন্যাসী সেখানে থাকিবে মনে করিল; কিন্তু রাজবাটীর জনকতক লোক কি সন্দেহ করিয়া সন্ন্যাসীকে তথা হইতে তাড়াইয়া দিল।"

কিছুদিন পরে সন্ন্যাসী বিষ্ণুপুরের রাজদ্বারে উপস্থিত হলেন। বিষ্ণুপুরের রাজা ক্ষেত্র সিংহ সন্ন্যাসীকে প্রতাপচাঁদ বলে মেনে নিয়ে দু'তিন মাস নিজের রাজবাড়ীতে রাখিলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন যে, সন্ন্যাসী একবার বাঁকুড়ায় যান। সেখানে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিজের অবস্থা তাঁকে বলুন।

সন্ন্যাসী বাঁকুড়ায় সরকারী সার্কিট হাউসের কাছে একটী তেতুলতলায় গিয়া থাকিলেন। প্রতাপচাঁদ ফিরিয়া আসিতেছেন, এ খবর লোকমুখে বাঁকুড়া অঞ্চলের সর্বত্র রাষ্ট্র হয়েছিল। রাজা

ক্ষেত্র সিংহ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া মানিয়া লইয়াছেন এ কথাও লোকে শুনিয়াছিল, সুতরাং নিঃসন্দেহচিত্তে সকলে দলে দলে প্রতাপচাঁদকে দেখিতে আসিল।

সেখানে সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রায় আটমাস জেল হাজতে বাস করার পর হুগলী দায়রা কোর্টে তাঁর বিচার হয়। বিচারে রাজের শান্তিভঙ্গের চেষ্টার জন্য সন্ন্যাসীর ছয় মাস কারাদণ্ড ও খালাসের পর চল্লিশ হাজার টাকার পরিমাণ এক বৎসরের নিমিত্ত জামিন দিতে হুকুম হয়। চব্বিশ পরগণার গৌরীপুরের জমিদার রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরীরা এই জামিন দেন।

সন্ন্যাসী "১৮৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের যে দিবসে খালাস হইলেন, সে দিবস হুগলীতে মহা সমারোহ হইল। পরদিবস অম্বোধ্যয় যোগ ছিল, সেই উপলক্ষে বিস্তর লোক হুগলী ও ত্রিবেণীতে আসিয়াছিল তাহারাও ঐ সমারোহে যোগ দিল। যখন জেলখানা হইতে জালরাজা বহির্গত হইলেন অমনি হাতীর উপর হইতে নবহত বাজিয়া উঠিল, দূরে কাড়া নাগড়া বাজিতে লাগিল, চারিদিকে হরিবোল পড়িয়া গেল, তিনচারিদল ইংরেজি বাদ্য বাজিয়া উঠিল। সকলে জালরাজাকে মহাসম্ভ্রমে সুখাসনে বসাইলেন, বাহকেরা সুখাসন স্কন্ধে তুলিল, চারিজন বালক চামর ব্যজন করিতে লাগিল। শতশত পতাকা দুলিতে দুলিতে আগে আগে চলিতে লাগিল। নগর প্রদক্ষিণ করিয়া শেষে কলের জাহাজে উঠিয়া রাজা কলিকাতায় আসিলেন এবং বাবু রাধাকৃষ্ণ বসাকের [1] বাড়ীতে প্রথম অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।"

জালরাজা বর্দ্ধমানের সম্পত্তির উদ্ধারের জন্য সুপ্রীম কোর্টে মামলা করলেন। মুচলেখার এক বছর কাটিয়ে তিনি ঠিক করলেন বর্দ্ধমান যাবেন। আগে কালনায় গিয়ে ঐখানকার রাজবাটীর দখল নেবেন মানস করেন। বর্দ্ধমান যাবার আগে তিনি উকীলদের পরামর্শমত ডেপুটী গভর্ণর এলেকজাণ্ডার রস সাহেবের কাছে দরখাস্ত করলেন যে বর্দ্ধমান্ থাকাকালীন ধনপ্রাণের রক্ষার জন্য বিধিমত উপায়ে পাহারার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হউক। [2] তার উত্তরে সরকার বল্লেন দরখাস্তকারীর আর্জি নামঞ্জুর। [3]

যাহা হউক জালরাজা কালনা রওনা হইলেন। "নৌকার বহর বড় মন্দ হইল না। রাজার নিমিত্ত একখানি পিনেস, সঙ্গীদের নিমিত্ত কয়েকখানি বজরা, চাকরদের নিমিত্ত পানসী, তদ্ভিন্ন পাকের নৌকা, স্নানের নৌকা, চিড়িয়াখানার নৌকা, গায়কদের নৌকা, তজ্জামের নৌকা, এইরূপ ৪০ কি ৫০ খানি নৌকা একত্রে বাহিত হইল।"

জালরাজা কালনায় পৌঁছিলে পর ২রা বৈশাখ বর্দ্ধমানের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট জে, বি, ওসলভি সাহেব তাঁকে হুকুম দিলেন লোকজনসহ সেখান ছেড়ে চলে যেতে। সে হুকুম না মানায়, সাহেব মিলিটারী এনে গুলি চালিয়ে সকলকে তারালেন। তিনজন মারা গেল, অনেকা-

---

১ রাধাকান্ত বসাক কোম্পানীর ষ্ট্রেজারির দেওয়ান ছিলেন। সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য জালরাজাকে প্রায় এক লক্ষ টাকা অর্থসাহায্য করেছিলেন।

2 "Your memorialist prays, therefore, that your Honour will be graciously pleased to grant to him (through the proper channel) such means of safeguard to protect his person and life, from any eventual insult or danger during the time he may be obliged to stay at Burdwan."

3 The prayer of this petition cannot be complied with.

Fort William, March 5. 1838. (Sd) Frederic Jas Halliday, Offg. Secy. Government of Bengal.

জন আহত। সন্ন্যাসী পালালেন কিন্তু গঙ্গার ওপারে শান্তিপুরে ধরা পড়ে হুগলীতে বিচারের জন্য প্রেরিত হলেন।

"মোকর্দ্দমার সময় হুগলীর চতুষ্পার্শ্বস্থ দুইতিন ক্রোশের অন্যূন দশ হাজার লোক নিত্য আসিয়া উপস্থিত হইত। জেলখানার দ্বার হইতে কাছারী পর্যন্ত ঠাসাঠাসি করিয়া দাঁড়াইত। যাহারা পথে স্থান পাইত না, তাহারা গাছে উঠিয়া বসিয়া থাকিত। যে দিকে চাও, সেইদিকেই লোক—লোকের উপর লোক,—পথে, গাছে, ছাদে। পাল্কী করিয়া শত সিপাহী-দ্বারা তাঁহাকে ঘেরাইয়া পাঠান হইত। তাহাতে কেহ জালরাজাকে দেখিতে পাইত না, পাল্কীর ছাদ ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইত না। লোকে তাহাতেই তৃপ্ত হইত; নিঃশব্দে অতি গম্ভীর ভাবে তাহারা তাহাই দেখিত, আর এক একদিন একবাক্যে আকাশ পূরিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিত— "জয় হউক"।

"প্রতাপচাঁদের দুর্গতি সকলের অন্তঃকরণ স্পর্শ করিয়াছিল। জাল প্রমাণের পূর্বেই তাঁহার পীড়ন আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়াই হউক, অথবা তাঁহার সম্বন্ধে পূর্ব রটনা অনুরোধেই হউক, আবালবৃদ্ধ সকলেই জালরাজার পক্ষ হইয়াছিল।"

জালরাজাকে হুগলীতে আনিয়া গোড়ায় দায়রায় সোপার্দ করবার মত তাঁর কোন দোষ পাওয়া যায় কিনা সেবিষয়ে প্রাথমিক অনুসন্ধান হয়। সেও প্রায় একটা পুরা মামলার মতই। দুই পক্ষের সাক্ষী সাবুদ আসিল। অনুসন্ধান করিলেন হুগলীর তখনকার ম্যাজিষ্ট্রেট স্যামুয়েল সাহেব। তিনি, জালরাজা যখন সন্ন্যাসী বেশে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হন তখন বর্দ্ধমানে ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। সেই সময় তিনি জালপ্রতাপচাঁদ সম্বন্ধে সবিশেষ সকল কথাই পরাণ বাবুর কাছে শুনেছিলেন, সুতরাং সেই অবধি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে জালরাজা একজন ভয়ানক জুয়াচোর। "এক্ষণে হুগলীতে তাঁহাকে আপন হাতে পাইয়া আপ্যায়িত হইলেন। কোথা হইতে অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিবেন। তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে সেইজন্য এখানে সেখানে পত্র লিখিতে লাগিলেন। কথিত আছে, তিনি এই নিমিত্ত পরাণ বাবুকে এক পত্র লেখেন। সামুয়েল সাহেব আরেকটী পত্র বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরকে লেখেন। ৪ এই চিঠির নকল জালরাজার তরফের লোকেরা জোগাড় করে কাগজে ছাপিয়ে দেয়—সেই নিয়ে খুব হৈ হৈ হয়।

সামুয়েল সাহেব পয়লা সেপ্টেম্বর জালরাজার মকদ্দমা সুরু করেন। সেইদিন তিনি

---

4 My dear Dwarkanath,

I was disappointed at your non-arrival, as I think you could speak more decidedly than any of the other witnesses to man's non-identity, but it is not of much consequence. I have no objection to make a bargain with you. I will let you off altogether, if you will proceure me the names of half-a-dozen good respectable witnesses from Baranagore, who know him as Kristolall. I dare say you could do this through Kalinath Roy Chowdhary, Mothooranath Mookerjee or any of your own servant. Let me know what you say to this. What scoundrel that Buddinath Roy is! If I had known his character, I would rather have gone without evidence altogether than have had his.

Remember I must have the evidence from Baranagore within a week or so. Persuade Mothooranath also to come. His *hoormut* and *izzut* shall be *hureck soorut se bahal.*

Yours truly,
F. A. Samuells.

এজলাসে বসে জালরাজাকে বল্লেন "তুমি আপনার নাম গোপন করিয়া অসৎ অভিপ্রায়ে মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার করিয়াছ। সেইজন্য তোমাকে আসামী করা হইয়াছে।"

তারপর সাক্ষীদের জবানবন্দী আরম্ভ হল। আসামী তরফের এটর্ণি হলেন মিস্টার শ ও মিস্টার গ্রাহাম আর মর্টন ব্যারিস্টার সাহেব হলেন কৌঁসুলী। "গভর্ণমেণ্ট আপনার চাকরদিগকে সাক্ষী দিতে পাঠাইলেন। সেক্রেটারি প্রিন্সেপ—একজন, সদর দেওয়ানীর জজ হাচিনসন একজন সাক্ষী, বোর্ডের মেম্বর প্যাটল—একজন সাক্ষী। 'ঐরাবত' নামক জাহাজ করিয়া গবর্ণমেণ্ট এই সকল সাক্ষীদিগকে মহাসমারোহে হুগলী পাঠাইলেন। বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর আপনার জাহাজে করিয়া আর একদিন আসিলেন। এইরূপে ঘটার আর সীমা রহিল না।"

এক্তারনামার উপর শপথ নিয়ে দ্বারকানাথ সামুয়েল সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে বলেন—"প্রতাপ চাঁদের সঙ্গে আমার বিশেষ সম্ভাব ছিল। প্রথমবার কলিকাতায় এসে প্রতাপচাঁদ আমার বাড়ীর রাস্তার পাশের গলিতে কান্তবাবুর বাড়ীতে ছিলেন। সেই সময়ে আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সেটা ওয়াটারলুর্ যুদ্ধ* পর শান্তি হল যখন সেই সময়ে। তিনি আমার সঙ্গে লাটসাহেবের বাড়ী ও অন্যান্য জায়গায় রোশনাই দেখতে গিয়েছিলেন। পরেও কয়েকবার তিনি কলিকাতায় এসেছেন—কলিকাতায় এলেই আমার সঙ্গে দেখা হইত। আমার ধারণা এদেশী লোকদের বাড়ীর মধ্যে তিনি একমাত্র আমার বন্ধু রামমোহন রায় ও রাজা গোপীমোহনের বাড়ীই যেতেন। তাঁতি বা শেঠেদের বাড়ী যেতে তাঁর সম্মানে ঠেকত। তাঁর সঙ্গে বহুবার দেখাসাক্ষাতের ফলে তাঁর চেহারা সম্বন্ধে আমার বেশ একটা ধারণা আছে। আসামী কে তা জানি না, তবে এটুকু নিশ্চিত যে সে প্রতাপচাঁদ নয়। আসামীর চেহারা দেখে একথা বলছি। যাঁর সঙ্গে এত হৃদ্যতা ছিল তাঁকে বিশ বছর বাদেও সম্পূর্ণরূপে ভোলা সম্ভব নয়; আগের চেহারার সঙ্গে অন্তত কিছুটা মিল আশা করা যায় কিন্তু এক্ষেত্রে আসামীকে প্রতাপ বলে মেনে নিলে মর্টন কিম্বা শ সাহেবকেও প্রতাপ বলে মেনে নেওয়া চলে।

গুরুদাস দেওয়ানকে চিনি। আমার সুপারিশই সে রাজার দেওয়ানের চাকরী পায়। প্রতাপের শেষ অসুস্থতার সময় গুরুদাসের কাছ থেকে প্রায় রোজই খবর পেতাম। সেই সময়ে আমার পিসিমা মারা না গেলে আমি নিজেই অম্বিকায় যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। গুরুদাস জানিয়েছিল যে প্রতাপ খুব অসুস্থ কিন্তু বুড়ারাজা ইংরেজ ডাক্তারদের চিকিৎসা করতে দেননি। শেষকালে শুনলাম যে কে এক গোঁসাই কবিরাজ বিষগুলি দিয়ে তাঁর শরীর বিষিয়ে দিয়েছে। গুরুদাস প্রতাপের পিত্তজ্বরের কথা উল্লেখ করেছিল। মৃত্যুর পূর্বে প্রায় এক বছর তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি।

আমি প্রতাপের চরিত্র ভালরকমেই জানি। তিনি কুসংস্কার বা ধর্ম্ম কোনটারই ধার ধারতেন বলে মনে হয় না। তাঁর জীবনধারা সম্বন্ধে তাঁর অনুতপ্ত হবার কোন লক্ষণও দেখি নি। পরাণবাবুর ভয়ে বা ধর্ম্মের খাতিরে তিনি যে তীর্থযাত্রা করবেন তা বোধহয় না। পরাণবাবুকে প্রতাপ ভয় ত' করতেনই না, বরং গোলাম হিসেবে দেখতেন। রাজা তেজচাঁদও ত' তাঁর বৃত্তিভোগী ছিলেন।

যখন এই জাললোকটা দেখা দেয় সেই সময়েই আমি প্রথম শুনি যে প্রতাপচাঁদ নাকি মরেন নাই। পরাণবাবুকে আমি চিনি না, বর্ত্তমান মহারাজাও আমার বন্ধু নহেন। পরাণবাবুর সঙ্গে রাণী বসন্তকুমারীর যে মামলা চলছে তাতে আমার আফিস রাণীর পক্ষের এটর্ণি। পরাণ-

* (৫) Waterloo র যুদ্ধ হয় ১৮১৫ সালের ১৮ই জুন।

বাবুকে আমার শত্রু বলেই জানি। তিনি বর্দ্ধমানের সরকারী মহলে আমার নামে যে দরখাস্ত দিয়াছেন তাতে আমার বিরুদ্ধে বলেন নাই এমন জিনিষ নাই। পরাণবাবুর সঙ্গে আমার এত খাতির যে তিনি জমিদারী দেখার কাজ থেকে বিদায় হলেই খুসি হই। বুড়ো রাজা তেজচাঁদের বিরুদ্ধে মকদ্দমায় প্রতাপচাঁদের বিষবাদের আমি সাহায্য করেছিলাম। আমার বহুকালের বন্ধু প্রতাপচাঁদের দেখা পেলে নিশ্চয়ই খুসি হব। টার্টন সাহেব যখন প্রথম আমায় এই দাবীদারের কথা বলে আমায় হুগলী জেলে গিয়ে তাকে দেখিয়া আসিতে বলেন, তখনই আমি টার্টন সাহেবকে বলেছিলাম যে প্রতাপচাঁদের বেঁচে থাকা অসম্ভব। লোকটাকে পরীক্ষা করবার জন্য আমি টার্টন সাহেবকে কয়েকটা প্রশ্ন দিয়েছিলাম—বন্দীকে জিজ্ঞাসার জন্য। আমি বলেছিলাম ঐগুলির উত্তর দিতে পারিলে আমি নিজে গিয়া দেখা করিতে পারি। টার্টন সাহেব পরে জানান যে ঐসব ব্যাপারের কিছুই আসামী স্মরণ করতে পারেন নি বলে উত্তর দিতে পারলেন না। এই ব্যাপারে, সুপ্রীম কোর্ট এবং এখানে এখন দেখে আমি নিশ্চিত যে সে তার সত্য পরিচয় দিচ্ছে না। সুপ্রীম কোর্ট ওর গলার স্বর ও ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করেছে। প্রতাপ ঐস্বরে পরিচয় দিচ্ছে না। সুপ্রীমকোর্টে ওর গলার স্বর ও ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করেছি। প্রতাপ ঐ স্বরে ঐভাবে কখন কথা বলত না।

মর্টন সাহেবের জেরার উত্তরে দ্বারকানাথ বলেন—

সুপ্রীম কোর্টে প্রতাপের পরীক্ষার সময় আমি আপনার পাশেই বসেছিলাম। আপনার প্রশ্নের যা জবাব সে দিয়েছিল তা' শুনেছিলাম। একথা সত্য যে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে যেতে রাজি হই নাই। সুপ্রীম কোর্টে দেখার আগেই আমার ধারণা হয়েছিল যে এ ব্যক্তি আমায় দ্বারকানাথ ঠাকুর বলে সনাক্ত করেছিল বটে কিন্তু তাতে কি? আমি তাকে প্রতাপচাঁদ বলে ত' চিনতে পারি নি। আমার কথামতই আপনি আসামীকে আমাকে সনাক্ত করতে বলেন। লোকটাকে আমি আগে কোনদিন যে দেখি নি সে বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম বলেই ভেবেছিলাম যে সেও হয়ত আগে আমায় দেখে নি। সে যদি আগে থেকে আমায় চিনে রেখে থাকে ত' আমি তার কি করতে পারি? ও ছিল তাকে পরীক্ষা করবার কেবল একটা উপায়। এঘরেই বোধহয় এমন বহুলোক আছে যাদের আমি চিনি না কিন্তু তা'রা আমায় চেনে। ঐ লোকটি আমার সম্পূর্ণ অচেনা বলে নিশ্চিত ছিলাম বলেই ঐ প্রশ্ন তুলেছিলাম।

ওয়াটারলুর সময় থেকে আমার চেহারার অনেকটা বদল হতে পারে কিন্তু যারা আমায় তখন ভালোভাবে চিনিত তারা এখনও আমায় চিনিতে পারিবে। প্রতাপের সঙ্গে হৃদ্যতা আমার চার পাঁচ বছরের। তিনি কলিকাতায় এলেই আমার সঙ্গে দেখা হত। একান্ত গোপনীয় বিষয়েও তাঁর সহিত আলোচনা হইত বলেই তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দেখবার জন্য আমার সুপারিশমত দেওয়ান বহাল করেন। কুসংস্কার তিনি হেসে উড়িয়ে দিতেন। প্রায়শ্চিত্ত করবার মত পাপ হয়ত তাঁর অনেক থাকতে পারে। ওয়াটারলুর যুদ্ধের পর যখন প্রথমবার তিনি কলকাতায় আসেন, তখন প্রায় বছরখানেক ছিলেন। দ্বিতীয়বার এসে মাস চারেক ছিলেন। তার পরেও তিনি কয়েকবার এসেছেন—দু'এক সপ্তাহ বা তার কিছু বেশী থেকেছেন। তিনি সর্টস্ বাজারে থাকতেন।

এ দেশীয় লোক সংসার ছেড়ে চলে গিয়ে অনেকবছর পরে ফিরে এসেছে এরকম একাধিক শুনেছি কিন্তু পোড়ানোর পর ফিরে এসেছে এমনটা শুনি নাই। (সকলের হাস্য)। কৃষ্ণচন্দ্র সিংহের সম্পত্তি আমি দেখাশুনা করি, তাঁর বাড়ীর অনেককেই চিনি। তাঁর রহস্যজনক অন্তর্ধানের কথা শুনি নাই। লালাবাবু সংসার ছেড়ে বৃন্দাবনে গিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন

জানি। কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্ তাঁর ছেলে নাবালক বলে সম্পত্তি দেখাশুনার ভার নেয়। আমি তাদের কাছ থেকে ইজারা নিয়েছি। কাউন্সিলের সদস্য ষ্টিউআর্ট সাহেব প্রতাপচাঁদের খুব বন্ধু ছিলেন। প্রতাপের পরিচিত বহুলোক আমার কাছে চাকুরী করে।

অনেক মকদ্দমায় আমি টাকা আগাম দিয়েছি। এই ছোট রাণীদের (অর্থাৎ প্রতাপচাঁদের স্ত্রীদের) মকদ্দমায়ও আগাম দিয়েছি। লোক না চিনে আমি কখন আগাম দিই না, এবং ফেরৎ পাবার ব্যবস্থাও ভালো ভাবে না রেখে দিই না।

এই ভূয়ালোকটা সম্বন্ধে রাধাকৃষ্ণ বসাক, জয়নারায়ণ চন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র দে তিনজনেই আমার কাছে এসেছিলেন। আমি তাঁদের বলেছি এ জাল মামলা। সত্যিকারের রাজা বলে প্রত্যয় হলে আমি খুসির সঙ্গে তাঁর জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে রাজি ছিলাম—তিনি আমার বন্ধু ছিলেন।

মর্টন সাহেবের জেরা শেষ হলে দ্বারকানাথ মর্টন সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন যে স্যামুয়েল সাহেবের আমার লেখা চিঠি নিয়ে খবরের কাগজে আলোচনা হয়েছে। ঐ বিষয়ে আপনার জিজ্ঞাস্য যদি কিছু থাকে ত' তার উত্তর দেবার জন্যই বিশেষভাবে আমি এখানে এসেছি।

মিঃ মর্টন—আমার কোন প্রশ্ন নাই।

মিঃ সামুয়েল—তবে আমিই প্রশ্ন করিব।

দ্বারকানাথ—উপস্থিত সংবাদপত্রের ভদ্রলোকেরা আশা করি যথাযথ বর্ণনাই লিখবেন। সেদিনকার মত এক ভুল খবর রটাবেন না যে ব্যথার জন্য আমি আসিতে পারি নাই।

জনৈক সাংবাদিক—আমাদের বলা হয়েছিল যে আপনার শরীর খারাপ তাই সে খবর আমরা দিয়েছিলাম। আপনি ত' উপস্থিত ছিলেন না যে আমরা জিজ্ঞাসা করব।

দ্বারকানাথ—যে আপনাদের এ কথা বলেছিল সে মিথ্যাবাদী।

অতঃপর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব চিঠি সম্বন্ধে দ্বারকানাথ যা জানেন তাই বলতে বল্লেন। বলায় দ্বারকানাথ বল্লেন—

আপনার সমন পাবার দিন বা পরদিন গ্রাহাম সাহেবের কেরাণী গোবিন্দ তার মনিবের কাছ থেকে এক চিঠি আনে। চিঠিতে আমাকে গ্রাহাম সাহেবের আফিসে দেখা করতে বলা হয়েছিল। ব্যাপারটা আমার কাছে আশ্চর্য্য ঠেকে কারণ গ্রাহাম সাহেবের সঙ্গে আমার যাতায়াত নেই। গোবিন্দ বলেছিল ব্যাপারটা এই তদন্ত সম্বন্ধে। ভাগ্যক্রমে আমার এটর্ণি জজ সাহেব তখন অফিসেই ছিলেন। তাঁর সামনে ছাড়া আমার বহু পরিচিত গোবিন্দের সঙ্গে কথা বলা যুক্তিযুক্ত মনে করি নাই। আমি জজ সাহেবকে ডাকিয়া তাঁর সামনে গোবিন্দকে বলি যে এ এ ব্যাপারে গ্রাহাম সাহেবের সঙ্গে আমি দেখা করিব না এবং তাঁর এই জাল মামলার সঙ্গে কোন যোগ রাখিতে চাই না। গোবিন্দ হেসে বলে যে এই উত্তরই সে আশা করেছিল। আমার বহু-পরিচিত গোবিন্দ ঐখানে দাঁড়িয়ে আছে—তাকে এবিষয়ে প্রশ্ন করা যেতে পারে (দ্বারকানাথের কথা শুনে গোবিন্দের ব্যাজার মুখ আরো ব্যাজার হইল)।

সোমবারে এই মকদ্দমায় সাক্ষ্য সম্বন্ধে আপনার কাছ থেকে সমন পাই। উত্তরে আমি জানাই যে বিলাতী ডাক সেদিন এসেছে এবং আমার অংশীদার প্রিন্সেপ সাহেবও উপস্থিত নাই। সেইদিনই সব চিঠির জবাব দেওয়া দরকার বলে ঐদিন আমার আসা সম্ভব নয়। একথাও আমি জানাই যে এমন ভালো সাক্ষীর কথা জানি যে তাকে পেলে আমার সাক্ষের আর বোধহয় দরকার হবে না। যখন সুপ্রীম কোর্টে আপনার সঙ্গে দেখা হয় তখনই লোকটী আসলে কে তা জানে এরকম লোকের নামও আপনাকে বলেছিলাম। আপনার বোধহয় সে নাম মনে ছিল না,

তাই এই চিঠিটা আমায় লেখেন। চিঠিটায় অন্যায় বা গোপনীয় কিছু নেই। কিন্তু আমার আফিস থেকে কেউ লুকিয়ে তার নকল জোগাড় করে সেইজন্য এবিষয়ে আমি অনুসন্ধান করেছি। যেদিন এই চিঠিটা পাই সেদিন শ' সাহেবের আফিসের বড়বাবু জয়নারায়ণ চন্দ্র আমার আফিসে বহুক্ষণ ছিল।

মিঃ শ—এসব কথা আপত্তিজনক। এটা অবান্তর এবং আমার উপর দোষারোপের চেষ্টা।

দ্বারকানাথ—আপনার বিরুদ্ধে কেউ দোষারোপ করছে না মিঃ শ। আপনি চিঠিটা চুরি করেছেন তা' ত' একবারও বলি নাই। এমন কি সেদিন আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাতও হয় নাই।

মিঃ শ—আমার কেরাণীর বিরুদ্ধে দোষারোপ হচ্ছে। আমি আপত্তি জানাচ্ছি।

ম্যাজিষ্ট্রেট—আপনার আপত্তি মানিলাম না। আসামীর কৌশুলী উপস্থিত। একমাত্র তার আপত্তিই শুনতে ধার্য।

মর্টন সাহেব কোন আপত্তি না করায় দ্বারকানাথ বলতে থাকেন—

জয়নারায়ণ যখন প্রথম এসে আমার ঘরে ঢোকে তখন চিঠিটা আমার হাতে বা টেবিলের উপর ছিল। জয়নারায়ণ এসে রাজা বৈদ্যনাথ হুগলী গিয়ে কেমন নাস্তানাবুদ হয়েছেন সেই গল্প ফাঁদল। সেখানে প্রসন্নকুমার ৬ ছিলেন। আমি তাঁকে বল্লাম এইসব বাজে গল্প শোনবার সময় আমার নেই, তুমি জয়নারায়নকে তোমার ঘরে নিয়ে গিয়ে শোনগে। আমি যখন আফিস থেকে বাহির হই তখনও জয়নারায়ন আফিসেই ছিল এবং তারপরেও কতক্ষণ ছিল জানি না।

তারপর আরো দু চারটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দ্বারকানাথের জবানবন্দী শেষ হল।

যারা জালরাজাকে দেখিবে বলে সকালে পথে দাঁড়িয়েছিল তাহাদের মধ্যে অনেকে সুবিধামত আদালতে ঢুকিয়াছিল। আর আদালতে যাহাদের জায়গা হইল না, তাহারা আদালতের চারপাশে গাছতলায় দাড়াইয়া বসিয়াছিল। সেইখানে থাকিয়া আদালত থেকে আসা যাওয়াকারীদের মুখে কে সাক্ষ্য দিল, কি সাক্ষ্য দিল তাহা শুনিয়া লইত, তাহা লইয়া আলোচনা করিত। এই রকমটা রোজই হইত। "সে দিবস সাক্ষীরা প্রতাপচাঁদের পক্ষে কথা বলিত, সে দিবস আর তাহাদের আহ্লাদের সীমা থাকিত না; সেদিন গঙ্গার বক্ষে শতশত নৌকা ছুটাছুটী করিত, ময়রার দোকানে খরিদ্দারের উপর খরিদ্দার ঝুঁকিত। ঘরে ঘরে সত্যনারায়ণের সিন্নি হইত। আর যে দিবস সাক্ষীরা বিপক্ষতা করিত, সে দিবস লোকে একেবারে ক্ষিপ্ত প্রায় হইত। সাক্ষীর প্রাণরক্ষা ভার হইয়া উঠিত।"

সেদিন দ্বারকানাথ হুগলী ঘাটের দিকে বাহির হওয়া মাত্র পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের অভিসম্পাতে পথটুকু মুখর হয়ে উঠিল। কেহ বংশের সর্বনাশ কামনা করিল কেহ গায়ে থুথু দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। এক মেছুনি লোকের ভীড় ঠেলিয়া যতটা সম্ভব কাছে আসিয়া তার আঁশচুবড়িটী দ্বারকানাথের দিকে ছুঁড়িয়া তাঁহার সামলাটুপির বদলে ঐ চুবড়ি পরাইয়া দিতে চারিপাশের লোককে অনুরোধ করিল। দ্বারকানাথের চারিপাশে তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ ছিল—চুবড়ি দ্বারকানাথের গায়ে লাগিল না। তবু কেহ উহা লইয়া মেছুনির কথামত কাজ করিতেও

(৬)* প্রসন্ন কুমার ঠাকুর

সাহস পাইল না। সম্মিলিত অভিশাপকে বিফল করিয়া দ্বারকানাথ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

তারপরেও প্রতাপচাঁদের মামলা অনেককাল চলিল। এই প্রাথমিক অনুসন্ধান এ দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় জালরাজাকে দায়রায় সোপার্দ্দ করা হল। ম্যাজিষ্ট্রেট স্যামুয়েল সাহেবকে বিচক্ষণতার জন্য অস্থায়ী থেকে স্থায়ী করা হইল। এতকাল মাহিনা মাসে সাত শত টাকা মাত্র পাচ্ছিলেন, ফ্রেন্ড অফ ইণ্ডিয়া কাগজের সুপারিশে তাহাও বাতিল।

হুগলীর সেসন্ কোর্টে এ ১৮৩৪ সালের ১৯এ নভেম্বর জেমস্ কার্টিস্ সাহেব জাল-রাজার বিচারের জন্য কোর্ট বসালেন। তিনি এই মামলার জন্য বিশেষ জুরীর তলব করে-ছিলেন কিন্তু তেলেনীপাড়ার জমিদার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর কেহই উপস্থিত হলেন না। তখনকার আইনানুসারে জুরীদের হাজিরা দিতে বাধ্য করাতে মফস্বলের কোর্টে ক্ষমতা ছিল না। তাই দায়রা জজ জেলার মুসলমানই আইনের কাজি মৌলবী সৈয়দ আমেদকে দ্বিতীয় জজ করে বসিয়ে বিচার আরম্ভ করলেন।

এবার ফরিয়াদী তরফেও সাহেব ব্যারিষ্টার আসিল এম, এ, বিনেল আসামী পক্ষে এবারেও শ' ও গ্রাহাম সাহেব স্বয় এটর্ণি আর ব্যারিষ্টার মর্টন সাহেব কৌসুলী রইলেন।

এবারেও দু তরফের সাক্ষীদের ফের ডাকা হল। তারাও প্রায় একই কথা বল্লেন।

গভর্মেন্টের সেক্রেটারী ও দ্বারকানাথের কার ঠাকুর কোম্পানীর অংশীদার প্রিন্সেপ সাহেবের সাক্ষ্যর পর দ্বারকানাথ সাক্ষ্য দিলেন। জবানবন্দীতে গতবার যা বলেছিলেন তাই এবং জেরার উত্তরে দু একটা বাড়তি কথা বল্লেন। বর্ধমানের রাজা তেজচাঁদের ছেলে প্রতাপ চাঁদের সঙ্গে তাঁর মৃত্যুর ৬।৭ বৎসর আগে থেকে পরিচয়। পরিচয় ও বন্ধুত্ব কলিকাতাতেই; দ্বারকা-নাথ নিজে বর্ধমানে কখনও যান নাই। এতবছর বাদে যে লোক নিজেকে প্রতাপচাঁদ বলছে সে আসলে প্রতাপচাঁদ কি না বলা শক্ত, তবে মনে হয় এ প্রতাপচাঁদ নয় কারণ এ লোকটী প্রতাপ-চাঁদের চেয়ে লম্বা ও রং তেমন ফর্সা নয়। প্রতাপচাঁদের রং অদ্ভুত ফর্সা ছিল। আসামী তর-ফের মামলা চালাবার জন্য দ্বারকানাথকে একবার বলা হয়েছিল। তখন তিনি টার্টন সাহেব মারফৎ আসামীকে প্রশ্ন লিখে পাঠান। প্রশ্নগুলি এমন যে সত্যকার প্রতাপচাঁদ কখনই তার উত্তর ভুলে যাবে না। আসামী একটীরও জবাব দিতে না পারায় তিনি আসামী জাল বুঝে তার সংস্রব ত্যাগ করেন। রাজা গোপীমোহন দেব প্রতাপচাঁদ ও তাঁর পিতার সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলেন। তিনিও প্রতাপচাঁদ যে মৃত এবং লোকটা যে ঝুঠো তা নিশ্চিত জানেন বলেই দেখা পর্যন্ত করতে অস্বীকার করেছেন। কার টেগোর কোম্পানী রাণী বসন্তকুমারীর ? মোক্তার এবং রাণীর বাবদে কিছু টাকা রাণীর এটর্ণি হজার সাহেবকে দিয়েছেন। রাজা তেজচাঁদ রাণীকে যে সম্পত্তি দিয়া গেছেন সেই সম্পর্কেই মামলা চলিতেছে। আসল প্রতাপচাঁদের হাজির হওয়ায় এ মামলার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই; কারণ এ মামলা কে রাজা তার উপর নির্ভর করে না।

---

*(৭) ১২ই জুলাই ১৮৩৮ (বাংলা শ্রাবণ ১২৪৫) এর সমাচার দর্পণে মোক্তার হিসাবে কারঠাকুর কোম্পানীর প্রদত্ত নিম্নলিখিত নোটিশ দেখি—

"নূতন চিনা বাজারের প্রজাগণ প্রতি আগে।—তোমারদিগকে পূর্ব্বক্ষণে সাবধান করা যাইতেছে যে তোমরা প্রত্যেক ব্যক্তি যে দোকানঘর অথবা গুদাম ভাড়া লইয়াছো তাহার ক্রেয়ার টাকা মদনমোহন কম্পুরিয়াকে দিবা না যেহেতুক তেঁহ যে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন তাহা হইতে ঐ বাজারের অধিকারিণী শ্রীমতী মহারাণী বসন্ত কুমারী জবাব দিয়াছেন কিন্তু মোং হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে

রাণীর মকদ্দমার উপর এ মকদ্দমার কোন প্রভাব আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় দ্বারকানাথ বলেন তাঁহার উত্তর মর্টন সাহেবেই ভাল জানেন কারণ তিনি ব্যারিষ্টার এবং আইনের প্রভাব নিয়ে তাঁরই বেশী কারবার।

যাহা হউক, শেষকালে দায়রায় রায় বেরুল।

কাজি সাহেব ফতওয়া দিলেন "সনাক্ত সম্বন্ধে সরকারের পক্ষে যে সকল প্রমাণ দাখিল হইয়াছে, তাহা আসামীর প্রমাণ অপেক্ষা গুরুতর নহে। আসামী বাস্তবিক কে, তাহা ফরিয়াদীর পক্ষ হইতে প্রমাণ হয় নাই। যতক্ষণ অপর ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন না হয়, ততক্ষণ প্রতাপচাঁদের নামধারণের অপরাধে তাহাকে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে না।"

জজসাহেব কিন্তু বলিলেন "আসামী কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী, সুতরাং নামধারণের জন্য তাহাকে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে।"

এইরূপে উভয়ের মধ্যে মতের অমিল হইল। জজ সাহেব তিন থেকে পাঁচ বছরের জেলের সাজা সুপারিশ করে নিজামৎ আদালতের মত চাইলেন।

নিজামৎ বল্লেন আসামীর, মহারাজ প্রতাপচাঁদের নাম নেওয়ার জন্য এক হাজার টাকা জরিমানা করা যায়; অনাদায়ে তাহার ছয় মাস কারাদণ্ড।

জজ সাহেবদের বিচারে হেরেও জালরাজার দল দমিল না। ১৮৩৯ সালের ৬ই আগষ্ট তারিখের "হরকরা"তে এটর্নি শ সাহেব এক ২২দফা নালিশ করে চিঠি লেখেন। তখন স্যামুয়েল সাহেব মেদিনীপুরে। সেখান থেকে তিনি তার দফাওয়ারি উত্তর দেন। সেটাও হরকরায় ছাপা হয়—১৩ই আগষ্ট। তাতে তিনি লেখেন—

১৬নং—দ্বারকানাথকে লেখা চিঠি।

কয়েকটা ছাপার ভুল ছাড়া এটা সম্পূর্ণ সত্য; তবে এটাও সত্য যে আসামী পক্ষের কৌসুলী যাহাতে যে কোন বিষয়ে জেরা করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে দ্বারকানাথকেও আমি সশরীরে আদালতে হাজির করেছিলাম। চিঠিটা কিভাবে জোগাড় করা হয় এবং তার কি ব্যবহার করা হয় সে বিষয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবে চিঠিটা কেন লেখা হয়েছিল সেটা বলা দরকার।

এই ধরণের প্রাথমিক অনুসন্ধানে যে ক্ষেত্রে প্রাইভেট প্রসিকিউসন থাকে না, সে সব ক্ষেত্রে কোম্পানীর আইন অনুযায়ী ম্যাজিষ্ট্রেটকে নিজস্ব কাজ ছাড়াও ফরিয়াদী পক্ষের কাজও করতে হয় এবং নিজে বা অধীনস্থ কর্মচারী দ্বারা জরুরী প্রমাণ ইত্যাদি খুঁজে বের করতে হয়। সকলেই স্বীকার করেন এটা বর্ত্তমান বিচার প্রণালীর একটা মস্ত দোষ। হ্যালিডে সাহেব এবিষয়ে সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন। কিন্তু সে কথা থাক্।

মিং কার ঠাকুর এণ্ড কোম্পানির দপ্তরখানায় নীচের লিখিত নামক ব্যক্তিকে ঐ ভাড়ার টাকা দিবা।

উইলেম প্রিন্সেপ।
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।
ডবলিউ এন হেজার।
মোক্তার জানব।
শ্রীমতী মহারাণী বসন্তকুমারী

কলিকাতা ১২ জুলাই ১৮৩৮ সাল।

আমি ফরিয়াদী হিসাবেই দ্বারকানাথের নিকট সাক্ষীর নাম জানিতে চাহিয়াছিলাম। আমার কর্ত্তব্য ছিল নামগুলি জোগাড় করা—তা আমি যে ভাবেই করি না কেন। মৌখিক জিজ্ঞাসা বা চিঠি লেখা বা নোটিশ জারী করা—কি উপায়ে উহা করিব তা' আমার সুবিধার উপর মাত্র নির্ভর করে। একটা পারস্পারিক চিঠি (প্রাইভেট লেটার) তে এ বিষয়ে লেখার কারণ তখন দ্বারকানাথকে আমি চিঠি লিখছিলাম—এক সাথে লেখায় সময় সংক্ষেপ হয়।

এ মামলার সুরু থেকেই অনুভব করি যে, যে কোম্পানীর আদালতের কায়দা যারা জানে না, তারা আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা করিবে; কারণ এ ধরণের মামলায় এতটুকু প্রমাণও বহু খোঁজ খবর বিনা জোটে না। গভর্মেণ্টকে সেইজন্য একজন পৃথক 'প্রসিকিউটার' নিযুক্ত করতে অনুরোধ করেছিলাম—কিন্তু তাঁরা এ বিষয়ে সাধারণ প্রথা থেকে কোন অন্যথা করতে রাজি হন নাই।

"জজ সাহেবরা যে যাহা বিচার করুন, বাঙ্গালীরা অনেকেই আপন আপন ঘরে বসিয়া জালরাজা সম্বন্ধে একপ্রকার মীমাংসা করিয়া লইল। কেহ বলিল "যদি এ ব্যক্তি প্রতাপচাঁদ না হইবে তবে পরাণবাবু এত ভয় পাইবে কেন?" কেহ বলিল "যদি এ ব্যক্তি সত্যই জাল হইবে, তবে গবর্নমেণ্ট ইহার নিমিত্ত এত ব্যস্ত হইয়া আপন ব্যয়ে পরাণবাবুর মোকর্দ্দমা চালাইবেন কেন? মেজেস্টর গোপনে পত্র লিখিবেন কেন? অবশ্য এ ব্যক্তির জন্য গবর্ণমেণ্টের ভয় হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে জানিতেন যে "প্রতাপচাঁদ মরেন নাই, রণজিৎ সিংহের সহিত মিলিয়াছেন।" রণজিতের স্বপক্ষব্যক্তি এখন বাঙ্গলার মধ্যে আসিয়া অতুল ধনসম্পত্তি অধিকার করিলে ভবিষ্যতে কোম্পানীর বিপদ ঘটিতে পারে। তাই গবর্ণমেণ্ট একপ্রকার চাতুর্য্য করিয়া প্রতাপচাঁদকে বঞ্চিত করিলেন।" যাহারা ধর্ম্মভীত, তাঁহারা ভাবিলেন "ধর্ম্ম আছেন, প্রতাপচাঁদ মহাপাপ করিয়াছিল, সে যদি আবার রাজত্ব পাইত, হইলে বলিতাম ধর্ম্ম মিথ্যা।" আরেকদল ভাবিলেন, "যথাশাস্ত্র চতুর্দ্দশ বৎসর ধরিয়া অজ্ঞাতবাস করিয়াও প্রতাপচাঁদ যখন রাজ্য পাইল না, তখন ধর্ম্ম মিথ্যা।"

"কেহ বলিল," অদৃষ্টই মূল। প্রতাপচাঁদ যে মহাপাপ করিয়াছিলেন, তাহাও অদৃষ্টহেতু। তিনি যে আর রাজ্য পাইলেন না, তাহাও অদৃষ্টদোষে। যাহা অদৃষ্ট থাকে, তাহা কে খণ্ডাইতে পারে?

"যাঁহারা কর্ম্মফল বাদী, তাঁহারা ভাবিলেন," যেমন কর্ম্ম, তেমনই ফল। ইহজন্মে হউক, পূর্ব্বজন্মে হউক, প্রতাপচাঁদ অবশ্য কাহাকেও বঞ্চিত করিয়া থাকিবেন, তাই আপনি বঞ্চিত হইলেন।

"এইরূপে সকলে এক একটা স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। যাঁহারা ধর্ম্মকর্ম্মের বড় পক্ষপাতী নহেন, তাঁহারা বুঝিলেন, "কেনা সাহেবেরা পরাণবাবুর অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছেন।" তৎকালে লোকের বিশ্বাস ছিল যে "ইংরেজদের প্রত্যেককে ক্রয় করা যায়, প্রত্যেকে ক্রীত হইয়া থাকেন।" কেহ কেহ কোন নূতন সাহেবের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করিলে অগ্রে জিজ্ঞাসা করিতেন "ইনি কাহার সাহেব?" অর্থাৎ কাহার ক্রীত। যাঁহার "কেনা সাহেব" থাকিত, তাঁহার সম্মান বঙ্গ সমাজে অতুল হইত। "কেনা সাহেব" তাঁহাকে কেবল বিপদ হইতে রক্ষা করিত। অন্য উপায়ে কেহ কোন গুরুতর বিপদ হইতে উদ্ধার হইলেও লোকে ভাবিত, এ ব্যক্তি "কেনা সাহেব" দ্বারা উদ্ধার হইয়াছে।

তখন পদে পদে বিপদ ঘটিত। বাঙ্গালীর মধ্যে শত্রুতা তখন আত্মীয়তার মতই গভীর ও গুরুতর ছিল। তাই একজন অন্ততঃ 'কেনা সাহেব' থাকিলে বড় সুবিধা হইত। তখনকার রাজ কর্ম্মচারীদের ক্ষমতাও এখনকার চেয়ে অনেক বেশী ছিল। স্বপক্ষে হোক্, বিপক্ষে হোক্ বিলক্ষণভাবে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন। তাই ধনবানেরা বহু অর্থব্যয় করিয়াও সাহেব কিনিতেন।

সাহেব কেনার পদ্ধতির বিশেষত্ব ছিল যে তাঁরা আপনারাই বাড়ী বহিয়া আসিয়া গলায় শিকল পরিতেন। অধিকাংশ সময়েই এহা ছিল সোনার শিকল, অর্থাৎ মোটা টাকা ধার লইতেন। তখন সাহেবদের সংসারে খরচ বড় বেশী ছিল। এমনিতেই বিলাতী জিনিষের দাম ছিল রীতিমত চড়া, তার উপর তাঁরা থাকতেন এক একটা খুদে নবাবের মত ধুমধামে। মাইনেতে কুলান সম্ভব ছিল না, তাই ধার করিতেন। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী হলে ধার শোধ করা যায় না তাহা জেনেও সাহেবরা ধার নিতেন এবং দেশী লোকেরা ধার দিতেন কারণ টাকার বদলে উপকার করে মহাজনের ধার শোধ করা যায় এটা দুপক্ষই বুঝতেন।

দ্বারকানাথ মুক্তহস্তে টাকা ধার ও দান ত' করতেনই, তাহা ছাড়া সাহেবী কায়দাতেও অনেকটা থাকিতেন, তাই তাঁহার "কেনা সাহেবের" সংখ্যার ইয়ত্তা ছিল না। তখনকার দিনে দ্বারকানাথের বেলগেছিয়া ভিলায় নিমন্ত্রণ হয় না, বা তাঁর সঙ্গে চেনা নাই স্বীকার করিতেই যেন সাহেবদের লজ্জায় মাথা কাটা যাইত। ও কথা স্বীকার করার মানে ছিল যে সে সাহেব "কেনা সাহেব" হইবার যোগ্য নয়।

আ লো চ না

ভারতের বহির্বাণিজ্য

কোনো দেশ সভ্যদেশের সঙ্গে জিনিস আমদানি বা রপ্তানি করলে তাকে বহির্বাণিজ্য বলে। বর্ত্তমান সভ্যযুগে একজন মানুষ যেমন তার সমস্ত প্রয়োজন এককভাবে মেটাতে পারে না, পরের সাহায্যে উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা অনুভব করে, একটি দেশের পক্ষেও সে কথা খাটে। স্বিতীয়তঃ কোনও দেশ সমস্ত চাহিদা মেটাতে সক্ষম হলেও যে পরিমাণ খরচ পড়ে, তার তুলনায় অন্য দেশে প্রস্তুত জিনিস কেনাই সুলভ। সুতরাং দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থের দিক দিয়ে বিবেচনা করেও বহির্বাণিজ্য ক্ষুণ্ণ করা সমীচীন নয়। আবার নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য—বিদেশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকাতেও বিপদ আছে। যুদ্ধ লাগলে হঠাৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। যুদ্ধ না লাগলেও সরবরাহকারী দেশে আন্তর্বিপ্লব বা ধর্ম্মঘটের জন্য—লেন দেন সাময়িকভাবে স্থগিত থাকে।এ সমস্ত বিবেচনা করে অর্থনীতির পণ্ডিতেরা আর পূর্বের মত অবাধ বাণিজ্যের (Free Trade) পক্ষপাতী নন। তাঁরা অনেক জিনিষ—বিশেষ করে জাতির জীবনধারণের প্রয়োজনীয় মালগুলি (Consumer Goods) দেশে প্রস্তুত করতেই বদ্ধ পরিকর। মোটামুটি এ সিদ্ধান্ত অবিবেচনা প্রসূত নয়। যতদিন বিশ্বযুদ্ধের হুমকী থাকবে বা ঠণ্ডালড়াইয়ের হাওয়া বইবে ততদিন যে কোনও দেশপ্রেমিক নিজের দেশকে অন্যদেশের ওপর নির্ভর করতে দেবে না। সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীর অবাধবাণিজ্যের নীতি আজকাল পুরানো, মরচেধরা হয়ে গেছে। অর্থনীতি রসায়ন বা পদার্থবিদ্যার মত দেশকাল নিরপেক্ষ বিজ্ঞান নয়। অর্থনীতি খানিকটা যুগধর্ম্ম দিয়ে প্রভাবিত হয়। দেশের বাইরে যখন হিংসার বেড়াজাল তখন বিশ্বভ্রাতৃত্বের স্বপ্ন দেখে অবাধ আমদানির সমর্থন করা অদূরদর্শিতার পরিচয়। সুতরাং ছুঁচ থেকে এ্যাটম বোমা তৈরী করতে পারা-এ রকম একটা আদর্শ দেশে থাকা বাঞ্ছনীয়।

অথচ কোন দেশই—এমনকি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মত ধনী দেশও—একেবারে বহির্বাণিজ্য বর্জ্জন করে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না। সুতরাং গঠনকারী মনোভাব নিয়ে প্রশ্নটি বিচার করা উচিত। এতদিন আমরা আমদানী প্রতিহত করতে চেয়েছি, কারণ ভারতবর্ষ বাইরে কাঁচামাল পাঠাতে ও সেই মাল বিদেশে পাকায় রূপান্তরিত হলে চতুর্গুণ দাম দিয়ে আমদানি করত। ভারত এই হীনমন্যতা থেকে মুক্তি পেয়েছে। আজ আমরা মোটরগাড়ী আমদানী বন্ধ করেছি কারণ দেশে গাড়ী তৈরী হচ্ছে। ঔষধ আসাও প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। কোটি কোটি টাকার মালিকও আমদানীর ছাড়পত্র Import Licence না পেলে বিদেশী দ্রব্য ভারতবর্ষে আমদানী করতে পারেন না। বাণিজ্যদপ্তরের অনুমতি ছাড়াও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুশাসন আছে। আমদানীর ব্যাপারে আমাদের সরকার অতি সন্তর্পণে ছাড়পত্র বণ্টন করছেন।

কিন্তু ঢালের একটা উল্টা দিক আছে। আমাদের দেশ আগে শিল্পে অনুন্নত ছিল, স্বভাবতঃই শিল্পোন্নত দেশকে আমরা ঈর্ষ্যা করতুম। আমরা চেয়েছি ভারতবর্ষ নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াক—এই আকাঙ্ক্ষা খানিকটা পূর্ণ হয়েছে, আমরা রেল এঞ্জিন, হাওয়াই জাহাজ তৈরী করছি। কিন্তু অতঃপর? এমন একদিন কি আসবে না যখন আমরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত

মাল উৎপন্ন করে বিদেশে সরবরাহ করতে চাইব? তখন যদি অন্য দেশ বলে তোমাদের পাকামাল আমরা নেব কেন? তখন আমরা কি জবাব দেবো? এতদিন না হয় চা, পাট, কাজুবাদাম, চামড়া পাঠিয়ে বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আনাছিলাম, কিন্তু ক্রমশঃ বাণিজ্যের ধারা বদলে যাচ্ছে। আজকাল ইলেকট্রিক পাখা ও সেলাইয়ের কল বিদেশে পাঠাচ্ছি। আমাদের মিলে তৈরী ছিট ইংলণ্ডেও চালান হচ্ছে। শিল্প আরও উন্নত হলে আমাদের রপ্তানির তালিকা আরও দীর্ঘ হবে। তখন অন্য দেশ যদি রক্ষণশুল্কের দেওয়াল তুলে দেয়। আমরা যাবো কোথায়? যে সব কারণে আমরা আমদানি খর্ব্ব করছি, সে সব কারণ তো অন্য দেশেও উপস্থিত হতে পারে। এই সব ভেবে দেখলে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে ভারতের বাণিজ্যনীতি বদলানর প্রয়োজন হতে পারে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র আজ অনেকটা এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র প্রয়োজনের অতিরিক্ত গম উৎপন্ন হলে বিদেশে বিতরণ করে এমনকি সমুদ্রের জলে ফেলে দেয়। এ ধরণের বড়মানুষী করতে ভারতের অনেক দেরী আছে। যুক্তরাষ্ট্র খুব উচ্চদরের জিনিস তৈরী করে। কিন্তু অনেক সময়ে দামে পশ্চিম জার্ম্মানী প্রভৃতির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। তাই বহুক্ষেত্রে —যুক্তরাষ্ট্র যখন অনুন্নত দেশকে ঋণ দেয়, তখন একটা কড়ার থাকে যে যন্ত্রপাতি একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র থেকেই কিনতে হবে। এইভাবে ঐ দেশ রপ্তানি বৃদ্ধি করে। বিধিনিয়ম এইখানেই সমাপ্ত হয় না। ক্ষেত্রবিশেষে অনুন্নতদেশ যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজ ছাড়া অন্য জাহাজে মাল আনতে পারে না। এতে করে জাহাজ ব্যবসায়ী লাভ করে। আমি এ নীতির নিন্দা করছি না। ঋণদান করলে এধরণের সর্ত্ত রাখা বা সুযোগদানের অঙ্গীকার করিয়ে নেওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্ট কেনেডি রপ্তানি বাড়াবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করছেন। আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে ভারবৈষম্য হওয়ায় ঐদেশ থেকে বিদেশে সোনা চালান যাচ্ছে, এতে করে ডলারের অবস্থা একটু দুর্ব্বল হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ডলারের দাম কমাতে চান না—রপ্তানি বাড়িয়ে আবার ডলারকে শক্তিশালী করতে চান। কেনেডি স্বদেশ-বাসীকে বলছেন উৎপাদনের খরচ কমাও, বিদেশীকে অধিকসংখ্যায় যুক্তরাষ্ট্রে আসতে দাও—পাসপোর্ট, ভিসার কড়াকড়ি কমাও ইত্যাদি।

যুক্তরাষ্ট্র লক্ষ্মীর বরপুত্র হয়েও অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। ভারত তার তুলনায় নগণ্য। সুতরাং এখন থেকে ভারতের রপ্তানির পথ খোলা রাখতে হবে এবং দক্ষিণ, উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিমে দ্বার নিযুক্ত করতে হবে। রপ্তানি করলেই আমদানি করা চলতে পারে, কারণ বহির্বাণিজ্যে মালের বদলে মালের লেনদেন হয় সুতরাং ঘুরে ফিরে এই কথাই দাঁড়াচ্ছে—ভারতবর্ষ নিকট ভবিষ্যতে সেই জিনিসগুলি বিশেষ করে উৎপন্ন করুক, যার অন্যান্য দেশের বাজরে চাহিদা আছে এবং যা অপেক্ষাকৃত সস্তায় ভারত তৈরী করতে পারে।

ভারতসরকার শিল্পসৃষ্টির দিকে মনোযোগ দিয়েছেন কিন্তু শিল্পবণ্টনের ব্যবস্থা খুব ন্যায়-সংগত হয় নি। এটা বহু পরিমাণে সত্য যে শিল্প-বণ্টন, শুধু অর্থনীতি নয়, অনেকটা রাজনীতি দিয়েও প্রভাবিত হয়েছে। সাধারণতঃ শিল্প সেইখানে গড়ে ওঠে যে যায়গা বন্দরের কাছে, যে যায়গা কাঁচামাল ও কয়লার সন্নিকট। এই দিক দিয়ে মাদ্রাজে যাত্রীবাহী গাড়ী তৈরী করায় কারখানা প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে বিশেষ যুক্তি নেই, কারণ মাদ্রাজে লোহা ও কয়লা অপ্রতুল। গৌহাটিতে তৈল সংশোধনগার স্থাপন এই হিসাবে খানিকটা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার, করণ পরিশ্রুত তেল পাঠাতে প্রচুর লম্বা পাইপ লাইন বসাতে হবে। এর দরুণ, সরবরাহ খরচ বৃদ্ধি পাবে। ভারতবর্ষের একটা প্রদেশে দুটি লোহার কারখানা থাকলে এক একটি প্রদেশেও দুটি লোহার কারখানা বসাতে হবে, এ যুক্তির পেছোনেও বিশেষ সার্থকতা নেই।

বিদেশে মাল রপ্তানি করতে হলে আর একটি সতর্কতার প্রয়োজন। যদি কারখানা রপ্তানি দ্রব্য উৎপাদনের জন্য মূলতঃ তৈরী হয়ে থাকে, তা হলে রপ্তানি কমে গেলে বা বন্ধ হলে তা ভগ্নোদ্যম বা অচল হয়ে থাকবে। এতে দেশের ক্ষতি। সরকার খানিকটা এই মনোভাব নিয়ে নতুন পাটকল স্থাপন নিরুৎসাহ করছেন। ইতি মধ্যে বিদেশী বাজারে ভারতের একটা নতুন প্রতিযোগী দেখা দিয়েছে। সেটা হচ্ছে চীন দেশ। রপ্তানি অব্যহত রাখতে হলে শুধু নিজের ক্ষমতার ওপরেই নির্ভর করা চলে না। বিদেশী প্রতিযোগীর বর্তমান ও ভাবী ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। কাঁচামালের বেলায় ভারতবর্ষ একাধিকবার এ রকম প্রতিযোগিতায় সম্মুখীন হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ পাট উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতীয় অভ্রের ক্রেতারা অন্য অনুকল্পের সন্ধান করছে।

জার্ম্মনী, জাপান প্রভৃতি দেশ বিশ্বযুদ্ধের আগে বিদেশে রপ্তানির ওপরে আর্থিক সাহায্য দিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ রকম আর্থিক সাহায্যে ফলবান্ হয় না। শুধু বিদেশী ক্রেতারা সস্তায় মাল পায়। অবশ্য bounty দিয়ে যদি বিদেশের শিশু শিল্পকে বিনষ্ট করা চলে, তা হলে এ ধরণের সাহায্য সার্থক হয়। কিন্তু bountyর ফল নাকচ করার জন্য আমদানীকারী দেশ প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। তারা আমদানি কর বসিয়ে দেশের শিশু শিল্পকে রক্ষা করতে পারে।

ঠিক এভাবে খোলাখুলি সাহায্য না দিয়ে, ভিন্ন উপায়ে পরোক্ষ সুবিধা দেওয়া যেতে পারে। শুধু রপ্তানীদ্রব্যের উপরে রেলের মাশুল কমিয়ে রপ্তানির সুযোগ বর্দ্ধিত করা যেতে পারে। ভারত সরকার রপ্তানি বাড়বার জন্য অনেকক্ষেত্রে রপ্তানি কর বসিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা স্বয়ং সম্পূর্ণ না হতে পারে।

আর একটি রপ্তানি বাড়াবার উপায় হচ্ছে—বহির্বাণিজ্য ব্যবসায়ীদের সত্বর মূল্য প্রাপ্তির সুযোগ দেওয়া। বিদেশে জিনিস পাঠিয়ে সাধারণ ব্যবসায়ীরা দাম আদায় করতে বেগ পেতে পারে। কিন্তু যদি সরকার এমন ব্যবস্থা করেন যে স্টেট ব্যাঙ্ক এরূপ সরবরাহের বিল সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়ে দেবে ও বিদেশীদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের দায়িত্ব নেবে, তা হলে রপ্তানি ব্যবসায়ীদের টাকা আটক থাকার কোনো আশঙ্কা থাকবে না। ইংলণ্ড রপ্তানি বাড়াবার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ভারত এই উপায় অবলম্বন করলে লাভবান হবে।

প্রফুল্লকুমার সরকার

সংস্কৃতি প্রসঙ্গ

নবনাট্য আন্দোলন

নতুন নাটক নিয়ে বর্তমানে কিছু কিছু নাট্যোৎসাহী মহলে বেশ পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে। বাংলা নাটকের আশ্চর্য প্রাদুর্ভাব কালে এ সব লক্ষণ নিঃসন্দেহে শুভময়। উৎসাহী শিল্পী-মহলের সততা এবং নাটক সম্পর্কিত নিষ্ঠাই, আমার মনে হয়, ভবিষ্যৎ বাঙলা নাটক এবং অভিনয়শিল্পকে এক নতুন পথে উজ্জীবিত করতে বিশেষ সাহায্য করবে।

সম্প্রতি গণনাট্য সংঘের 'সঞ্চারী' শাখার উদ্যোগে দুটি নাট্যানুষ্ঠান (যথাক্রমে ১৩ই ও ১৪ই ফেব্রুয়ারী, '৬১) দক্ষিণ কলকাতাস্থ 'মুক্ত অঙ্গন' রঙ্গ মঞ্চে অনুষ্ঠিত হলো। 'সঞ্চারী' গোষ্ঠী প্রথম দিন পরিবেশন করলেন একজন তরুণ নাট্যকার বীরেন্দ্র মিত্রের 'আসামী'; দ্বিতীয় দিন অভিনীত হলো একটি যাত্রা-নাটক : 'শেষ-বিচার'।

বীরেন্দ্র মিত্রের 'আসামী' নাটকটি বক্তব্য বিশিষ্টতায় দর্শক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলে মনে হয়। নাটকটিতে ঘুণ ধরা বর্তমান সমাজনীতি, সামাজিক অব্যবস্থা ইত্যাদির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। আলোচ্য নাটকের লেখক অবশ্য জন গলসওয়ার্দির বিখ্যাত নাটক 'জাস্টিসে'র ভাবাদর্শে বর্তমান নাটকের বক্তব্যকে প্রসারিত করবার চেষ্টা করছেন। অবশ্য উল্লিখিত বিদেশী নাটকটির প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের সুরটিকেই 'আসামী'র নাট্যকার তাঁর কাজে লাগিয়েছেন। 'আসামী' নাটকের অন্তর্নিহিত বক্তব্য দর্শকমনে রেখাপাত করবে; তথাকথিত সমাজব্যবস্থার একদেশ-দর্শিতা এবং পরিবেশ সম্পর্কিত অন্যান্য সমস্যাকে উপনীত করে নাট্যকার দর্শকমনে অন্যতর একটি জিজ্ঞাসা জাগ্রত করবার চেষ্টা করেছেন। বক্তব্য বিষয়টি বলিষ্ঠ, কিন্তু নাট্যক্রিয়া এবং নাটকীয়ত্বের প্রয়োজনে নাট্যকাহিনী পরিমাণানুযায়ীও ঘনীভূত হয়নি—সেজন্য, যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্বেও কয়েকটি দৃশ্য বিন্যাস এবং নাটকীয় পরিবেশ রচনা বিশেষ ক্লান্তিকর, স্তিমিত বলে মনে হয়েছে।

'আসামী'র অভিনয়াংশ মোটামুটিভাবে উপভোগ্য। অননুশীলন জনিত কিছু কিছু ত্রুটি কয়েকজনের অভিনয়ে প্রকট হয়ে উঠেছিল। সীতা মুখোপাধ্যায়, মীনা জানা এবং অজিত সেনগুপ্তের অভিনয় বিশেষ প্রশংসার দাবী করে। প্রম্পটারের নেপথ্যে পাঠ অনেক সময় অভিনেতার কণ্ঠস্বরের সমান্তরাল হয়েছে। সংলাপ মাঝে মাঝে দীর্ঘ এবং অলঙ্কারাচ্ছন্ন হয়েছে; অনুপ্রাসকে বারংবার নিমন্ত্রণ জানাবার ফলে সংলাপের বিশেষ ব্যঞ্জনা ক্ষেত্রবিশেষে ব্যহত হয়েছে। দৃশ্যসজ্জা সাধারণ, তবে আরো কিছু মনযোগের অপেক্ষা রাখে। নাটকটির উপস্থাপনা প্রশংসনীয়; আবহসঙ্গীত ও আলোকসম্পাত পরিবেশানুগ। উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় নাটকটি

পরিচালনা করেছেন।

পরিকল্পনা, বিন্যাস এবং সাময়িক অভিনয়ের দিক থেকে 'সঞ্চারী'র যাত্রা-নাটক 'শেষ-বিচার' দর্শকমনে রস সঞ্চার করতে সক্ষম হয়। উক্ত যাত্রা-নাটকটিতে শোষণকারী রাজা-তন্ত্রের পরাজয় এবং জনতার উত্থানকে দেখানো হয়েছে। পরিচালক অজিত সেনগুপ্ত যাত্রার বিশেষ রীতিতে এক আধুনিকী রূপ দান করতে সক্ষম হয়েছেন। 'সঞ্চারী' গোষ্ঠীর মিলিত অভিনয় 'শেষ-বিচার'কে নতুন শ্রী দান করেছে॥

মলয়শংকর দাশগুপ্ত

স মা লো চ না

ইডেনে শীতের দুপুর ॥ শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু প্রকাশক। বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড। ১ শংকর ঘোষ লেন। কলিকাতা-৬ মূল্য ৩·৭৫। ডিমাই পৃঃ ১৭৮

খেলার রাজ্যে ভাবোদ্বেল সাহিত্যসৃষ্টির অবকাশ ক্রিকেটে যত আছে, এত আর কোন কিছুতে নেই। ইংরাজী ভাষায় ক্রিকেট সাহিত্য যাঁরা পাঠ করেছেন, তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করবেন, মহাসমৃদ্ধিশালী ইংরেজী সাহিত্যের প্রথম পংক্তিতে স্থান পাবার যোগ্যতা আছে তার। সে রসসমৃদ্ধ, অলঙ্কার মন্ডিত ও ছন্দোময়। ক্রিকেটের বিকল্প নয় সে সাহিত্য পাঠ ; ক্রিকেট দেখার চেয়ে সূক্ষতর রসানুভূতি মেলে তাতে। আমি তো বলি, ক্রিকেটের দীর্ঘ ও গৌরবময় ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ ইনিংস ব্যাট থেকে উৎসারিত হয়নি, তা হয়েছে একজনের কলম থেকে, তাঁর নাম নেভিল কার্ডাস।

কার্ডাস মূলত সঙ্গীত-সমালোচক। সঙ্গীতেরই তান-লয়-যতি, মীড়-মূর্চ্ছনা-গমক সব তাঁর কাছে ধরা পড়েছে ক্রিকেটেও। এবং এত কিছু যে ক্রিকেটে আছে, তারও খবর লোকে জেনেছে সঙ্গীত সমালোচক কার্ডাসের ক্রিকেট-সমালোচনা পড়ে।

আমাদের দেশে সঙ্গীত সমালোচক নেই, কিন্তু সাহিত্য-সমালোচক আছেন, আছেন রসঘন বৈষ্ণব কবিতার রসিক সমঝদার। শুধু সমঝদার নয়, সে রসকে ভাষায় রূপায়িত করার অনবদ্য দক্ষতাসম্পন্ন একজন কলম ধরেছেন ক্রিকেট রচনায়।

কবির দৃষ্টিতে অতি সাধারণ বস্তুও রূপময় হয়ে ওঠে। বর্তমান লেখকের কবিতা রচনার অভ্যাস আছে কিনা জানিনা, কিন্তু বিভিন্ন ক্রিকেটারের খেলার ধরণ অনুধাবন করে তিনি যেভাবে তার বিশ্লেষণ করেছেন, জীবন ও প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশের সঙ্গে উপমা দিয়ে তাকে বাঙ্ময় সাকার রূপ দিয়েছেন, তা যে কবিকৃতি তাতে সন্দেহ নেই। একথা ঠিক যে সব খেলার মধ্যে ক্রিকেটেই চরিত্রের প্রতিফলন সবচেয়ে বেশী ধরা পড়ে। তবে ধরা পড়ে বলেই তাকে ধরতে পারা সহজ হয়ে যায় না, আর ধরে নিয়ে তা ভাষার মাধ্যমে গেঁথে রাখা ও সর্ব-সাধারণে পরিবেশন করা অনেক বেশি দুরূহ কাজ।

শ্রদ্ধেয় তারাশঙ্করবাবু একবার আমায় বলেছিলেন একঘন্টা ক্রিকেট দেখেই পালিয়ে এসেছিলেন তিনি। অন্তত আজকের ভারতীয় ক্রিকেটের যে শ্মশানরুদ্র রূপ, তাতে অনেকেরই পালিয়ে আসার কথা। তবে রসিক অশ্বত্থ বৃক্ষ যেমন নীরস পাষাণ থেকেও রস সংগ্রহ করে, তেমনিভাবেই ক্রিকেটরসিক শ্রীযুক্ত শঙ্করীপ্রসাদ বসুও বর্তমানের সেই শ্মশানরুক্ষ ভারতীয় ক্রিকেট থেকেও রস আহরণ করতে পেরেছেন এবং তা এমনভাবে পরিবেশন করেছেন যে এযুগের ক্রিকেট খেলা দেখার চেয়ে তাঁর রচনা পাঠে আনন্দ মিলবে অনেক বেশি।

রসের সাধারণীকরণের প্রসঙ্গ দিয়ে গ্রন্থের অবতারণা করেছেন লেখক। ক্রিকেট মাঠের সাধারণীকৃত রসে ক্রিকেটের মাহাত্ম্য অনেক কমে আসার পরও তিনি ক্রিকেটের সাধারণ রসকেই অসাধারণ করে অরসিকদেরও আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পেরেছেন বলেই আমার বিশ্বাস।

আজকে ভারতের ক্রিকেট বলতে যাঁদের বোঝায় তাঁদের প্রায় সবাইকে খুঁজে পাই এই গ্রন্থে। শুধু খুঁজেই পাইনা, খেলার ধরণটি চিনে নিতে পারি, আর সেই খেলার ধরণ থেকে ধরতে পারি তাঁদের ব্যক্তিচরিত্র। "বেহিসেবি রূপসচেতন" বাঙালি সমাজ "দায়িত্বশীল বলিষ্ঠ সাধক" পঙ্কজ রায়কে যুক্তি দিয়ে বাঙলার শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার বলে প্রতিষ্ঠা করেছেন লেখক।

আর "দায়িত্বহীন" যে অবাঙালিটিকে লেখক ভালোবাসতে চান না, তাঁর পিছনে কিন্তু "হাততালি" দিয়েই শেষ করেননি তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, "তথাপি আমার গুরু শ্রীমুস্তাক আলি।" লেখকের হিসেব মত ক্রিকেট চরিত্রে পঙ্কজ অবাঙ্গালী, আর পুরো বাঙ্গালী হলেন মুস্তাক আলি। ঘরের ছেলের বেলায় দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে পক্ষপাত থাকলেও পরের সেই ছেলেকেই "বাঙ্গালী ভালোবাসে যে যথেষ্ট হিসেবী নয়, সহসা ঝলসে উঠতে পারে, রাঙিয়ে দিতে পারে আকাশপ্রান্ত রক্তরাগে, তারপর যদি হারিয়েই যায় তো ক্ষতি কি, কল্পনার রোমন্থন তো রইল।

মুস্তাকের খেলা কতটুকু বা দেখতে পেয়েছে লোকে! কিন্তু "একবার দেখাই চির-জীবনের সঙ্গী হয়ে থাকে"। আর একবার ও যিনি দেখতে পাননি, "ইডেনে শীতের দুপুরে-এ" প্রবেশ করলে তাঁর কল্পনা সজীব হয়ে প্রত্যক্ষ করবে সেই "তরুণ বাসনা শিখা" যে রোমান্স মুস্তাকের সর্বস্ব সেই রোমান্সের আবেশে পাঠকও "মুঠো খুলে বাজি ধরে উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে দিতে পারবেন রূপকথার রাজ্যে, তেপান্তরের মাঠে।"

"অসীম প্রাণের নিরন্তর ফুটন্ত একটি বিপুল আধার" সুটে ব্যানার্জি; সুইং বোলার মন্টু ব্যানার্জি যে "বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ ধরে দিতে পারে চাঁদ", আর বাংলাদেশের সবচেয়ে "আক্রমণাত্মক বোলার" এন চৌধুরী যে মুস্তাক, মানকড় ও অমর নাথকে দিয়ে হ্যাটট্রিক করে-ছিলেন—এদের তিনজনের বর্ণনা ও বাঙ্গালিয়ানার বিশ্লেষণ করেছেন লেখক বিশেষ মুন্সি-য়ানার সঙ্গে। অমর নাথকে লেখক বলেছেন "প্রাকৃতিকতার ক্রীড়ারণ্যে সচল বনস্পতি।" "ব্যাটিং-এ, বোলিং-এ ও অধিনায়কতায় সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয়, অন্তর্নিহিত যোগ্যতায় ব্র্যাড ম্যানের সমতুল অমর নাথ" কেন পূর্ণ সার্থকতা লাভ করতে পারলেন না, তার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে লেখক বলেছেন :

"কীর্তিমন্দিরের হর্ম্যতল ছেড়ে দূর সমুদ্রের ফেনিল তরঙ্গদোলায় দুলছে একটি দুরন্ত বালক, ওঠাপড়াতে যার আনন্দ, ঘন গর্জনের সঙ্গে তরঙ্গের টুঁটি ধরে যে চীৎকার করে বলছে—ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন। সমুদ্র ও মরুভূমির মাঝখানে বিস্মৃত যার জীবন, সেই ক্রিকেট খেলতে এসে নাম নিয়েছে অমর নাথ।"

এর পর লেখকের ভাবালুতা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু চিত্রায়নে কোথাও শৈথিল্য জাগেনি। "বিষণ্ণ আভিজাত্যের প্রতীক" দেখেছেন তিনি মার্চেন্ট এর মধ্যে। ক্রিকেটে আমাদের "অযৌক্তিক ভাবালুতা ও কাব্যানুরক্তির উৎসরূপে" বিজয় মার্চেন্ট-এর খেলাকে আমরা পাইনি, তাতেই বিজয় মার্চেন্টের জয়, একথা স্বীকার করে লেখক ক্রিকেট সম্বন্ধে তাঁর ভাবালুতার ভারসাম্য রক্ষা করেছেন সুন্দরভাবে। আর "ক্রিকেট পৃথিবীতে" মহেশ্বর্যে নয় এবং সম্পদে ভীত এক শান্ত মহিমার নাম যে বিজয় হাজারে, " এ তত্ত্বও তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

যা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েও পারেননি, তা হল রামচাঁদ কনস্ট্যান্টাইন এর খাটো সংস্করণ। আর মোদী-উম্রিগরকে নিয়ে উচ্ছ্বাস করার কতটুকু বা আছে। খাঁটি ক্রিকেটারের সমাবেশে ভারতের যোগ্যতম প্রতিনিধি হিসেবে "সহাস্য সুন্দর সুভদ্র" ফাদকার এর মনো-নয়নেও আপত্তি করবো না। "ইংরেজ লেখকদের লেখনীতে রোমান্সরস সঞ্চার করবার জন্য

আমাদের দেউলিয়া নবাবিয়ানা দেখানোর মূর্ত প্রতিবাদ ভিনু মানকড়" একথাও মানবো।

আপত্তি করবো শুধু এডারিচ-কে যমজের অন্যতম বলায়, ভারতকে ক্রিকেটের অন্ত্যে-বাসী বলে ঘোষণা করায়।

ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে কলকাতায় অনুষ্ঠিত পঞ্চম টেস্টম্যাচটিতে ক্রিকেটের যে রূপ দেখেছিলাম, তা "আর্ট নয়, কমার্শিয়াল আর্ট।" তবু তা নিয়ে যে ভাববিহ্বল রসসৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন লেখক, তা দেখে বুঝতে পারছিনা কারসঙ্গে তুলনা করবো তাঁকে। শ্রীরাধিকার সঙ্গে, না চন্দ্রাবলীর। চন্দ্রাবলীর রসস্ফুরণে রসময়ী শ্রীরাধিকার সান্নিধ্য প্রয়োজন হয়। আর শ্রীরাধিকা নিজেই নিত্যরসাধার। আমাদের গ্রন্থকারের ক্রিকেট রসস্ফূর্তির জন্য রসসঞ্চারী ক্রিকেট না হলেও চলে, ক্রিকেটের রস আপনা থেকেই ঝরে তাঁর মনে ও কলমে।

ছাপা, কাগজ ও ছবি রচনার অনুরূপ হলে বইখানা রসের পূর্ণ পাত্র হতে পারতো।

আরবী

কৃষি ও সমবায় ॥ নিরঞ্জন হালদার। রেনেশাঁস পাবলিশার্স কলিকাতা—১২। সাড়ে তিনটাকা

১৯৫৯ সালের জানুয়ারী মাসে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে সমবায় কৃষি-ব্যবস্থা গৃহীত প্রস্তাব নিয়ে সারা দেশে অনেক তর্ক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। গত বছরের গত জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভা ও পরিকল্পনা কমিশনের এবং বিভিন্ন রাজ্য উন্নয়ন বিভাগের প্রতিনিধি ও সদস্যেরা মিলিত হন। কি উপায়ে কৃষি উৎপাদন বেশ দ্রুত গতিতে বাড়ান যায়, প্রতিনিধিদল তা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। পরিকল্পনা কমিশনের অন্যতম সদস্য শ্রী শ্রীমান নারায়ণ সাংবাদিকদের এক বৈঠকে বলেন যে, তৃতীয় পরিকল্পনা কালে ২০,০০০ যুগ্ম সমবায় সংস্থার আওতায় আসবে। এইভাবে যুগ্ম সমবায় কৃষি সংস্থার প্রবর্তন হলে, শতকরা ৩০ ভাগ কৃষি উৎপাদন বেড়ে যাবে বলেও আশা করা হয়েছে, সরকারের নীতিই তার প্রমাণ।

শ্রীনিরঞ্জন হালদার তাঁর কৃষি ও সমবায় পুস্তকে সর্বসমেত ১৫টি অধ্যায়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি সমস্যার সঙ্গে সমবায়ের সম্পর্ক নিয়ে যে সব তত্ত্ব ও আলোচনার অবতারণা করে সমস্যাটির সঙ্গে আমাদের যে ভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন তার জন্য ভারতীয় অর্থনীতির সমস্যা নিয়ে যাঁরা সামান্যও চিন্তা করেন, তাঁদের কাছে নিশ্চয় কৃতজ্ঞতা ভাজন হওয়ার দাবী রাখতে পারেন। যুগ্ম কৃষি সমবায় পদ্ধতির কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে যে অপরিহার্য্যতার যুক্তি আমরা এতদিন শুনে এসেছি, শ্রীনিরঞ্জন হালদারের নিরপেক্ষময় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিপূর্ণ রচনাগুলি সেই চিরাচরিত বিশ্বাসের মূলে নাড়া দিয়েছে। যুগ্ম সমবায় কৃষি পদ্ধতির মূল যুক্তি হল, এই ব্যবস্থার প্রবর্তন হলে, ছোট জমিগুলিকে একত্র করা যাবে এবং ফলে কৃষি উৎপাদনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্তন সহজ হবে। আমাদের দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তাই ভাবতে শিখেছেন, যেহেতু যুগ্ম সমবায় কৃষি ব্যবস্থায় চাষের জন্য ক্ষেত গুলিকে আকারে বড় করা যায়, এবং যেহেতু ক্ষেত বড় না হলে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ সহজ হয় না, এবং কৃষি উৎপাদনে বিজ্ঞানের প্রয়োগ না হলে উৎপাদন বাড়ে না, সুতরাং যুগ্ম সমবায় কৃষি পদ্ধতিই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষি সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। শ্রী হালদার, তাঁর রচনার পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে যে সব তথ্য ও তথ্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে যে সব আলোচনা করে সমস্যাটির সঙ্গে

আমাদের নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, তাতে বোধ করি, সমস্যাটির চিরাচরিত সমাধানের ওপর আর একবার চিন্তা করার প্রয়োজন স্মরণ করিয়ে দেয়।

ভারতীয় অর্থনীতি এমনই এক বিষয়বস্তু যাকে নিয়ে ভাবপ্রবণ অথবা রোমান্টিক' হওয়া চলে না। অর্থনৈতিক তত্ত্ব যুক্তি পূর্ণ হতে পারে। যৌথ সমবায় কৃষি পদ্ধতি তত্ত্ব যুক্তিপূর্ণ হলেই কার্যকরী হবে, এমন নাও হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপে আমরা বলতে পারি, ছোট ক্ষেতে উৎপাদন কম হয়, যুক্তি হল, ছোট ক্ষেতে ট্র্যাক্টর প্রভৃতি যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভব হয় না। অর্থনৈতিক তত্ত্ব হিসাবে এ খুবই যুক্তিপূর্ণ। কিন্তু জাপানের অভিজ্ঞতা হতে, আমরা কি এ যুক্তি জেনে নিতে পারি? জাপানে ক্ষেতগুলি আকারে ছোট, এবং ছোট ক্ষেতে চাষের জন্য ট্র্যাক্টরের ব্যবহার হয় না। অথচ একর প্রতি উৎপাদনে জাপান এশিয়ায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে এবং পৃথিবীর মধ্যেও বেশ সম্মানজনক স্থানের অধিকারী। জাপানের দৃষ্টান্ত হতেই আমরা বলতে পারি, কৃষি উৎপাদন নির্ভর করে ভাল সার, ভাল বীজ ও জল সেচের উপর। কৃষি ঋণ সমস্যার সমাধান ও ভূমি সংস্কারের উপরেও কৃষিউৎপাদন অনেকাংশে নির্ভরশীল। এই প্রসঙ্গে আমরা সমবায় বিশেষজ্ঞ ডাঃ ওটো সিলারের মতামত উল্লেখ করতে পারি। ডাঃ সিলার ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করে সমবায়ের মাধ্যমে মূলধন বিনিয়োগ এবং পরিকল্পিত উপায়ে ক্রয়-বিক্রয়ের সুপারিশ করেন। এতে বৃহদায়তন কৃষি কর্মের ফল পাওয়া যাবে বলে তিনি মনে করেন।

গণতান্ত্রিক পথে যে সমস্ত দেশে যৌথ সমবায় কৃষি ব্যবস্থা নিয়ে পরীক্ষা চলেছে ও চলছে তাদের অভিজ্ঞতা হতেও আমরা শ্রীহালদারের সঙ্গে একমত হয়েই বলতে পারি তত্ত্বের দিক দিয়ে যৌথ সমবায় কৃষি ব্যবস্থা যতই যুক্তিপূর্ণ হোক না কেন, কার্যকরীতার দিক হতে এই ব্যবস্থাই যে একমাত্র ব্যবস্থা এমন ভাবপ্রবণ রোমান্টিক মনোভাব অনুদার গোঁড়ামি ছাড়া আর কিছুই নয়। ইস্রাইল ও মেক্সিকোর অভিজ্ঞতা হতে যদি কোন কিছু শিক্ষণীয় থাকে, তাহল যৌথ সমবায় কৃষিপদ্ধতির নিজস্ব কোন ঐন্দ্রজালিক শক্তি নেই। আলাউদ্দীনের আশ্চর্য প্রদীপের মত এই ব্যবস্থা ভারতবর্ষের কৃষি সমস্যার সমাধানে অঘটনও ঘটাতে পারবে না। ব্যক্তি মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির জাগরণের ভিত্তিতে সহযোগীপূর্ণ মনোভাব সৃষ্টি করার পূর্বেই যদি ওপর হতে যৌথ সমবায় কৃষি পদ্ধতি চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সমবায়ের উদ্দেশ্যই শুধু ব্যর্থ হবে না, মানুষের ঐ অন্তর্নিহিত শক্তির বিনাশ ও হতে পারে। সুতরাং অর্থনীতিতে রোমান্টিসিজম শুধু ভয়াবহই নয়, বিপজ্জনকও বটে।

রাম ভট্টাচার্য

★ ARUNA ★

more DURABLE
more STYLISH

SPECIALITIES

Sanforized :
Poplins
Shirtings
Check Shirtings
SAREES
DHOTIES
LONG CLOTH
Printed :
Voils
Lawns Etc.
in Exquisite Patterns

ARUNA
MILLS LTD.
AHMEDABAD

★ ARUNA ★